দক্ষিণের তীর্থাঞ্চল

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

△ বৈশাখ ১৩৪৯

প্রকাশক

পলাশকুমার মুখোপাধ্যায়

৪৩ অরবিন্দ রোড

নৈহাটি

উত্তর ২৪ পরগনা

মুদ্রক

অরুণকুমার হেঁস

র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন

৫৩ বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ

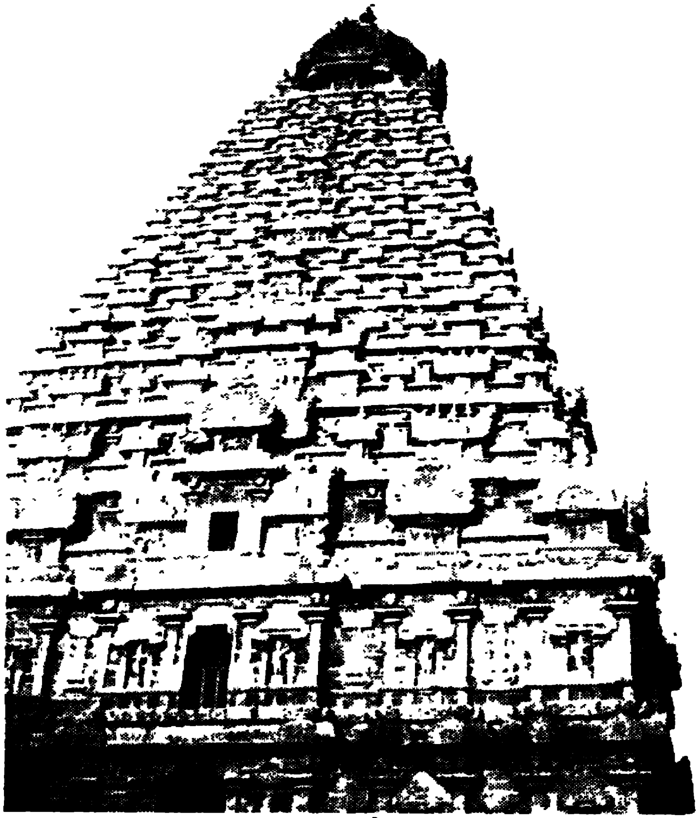
বিজন ভট্টাচার্য

ভূমিকা

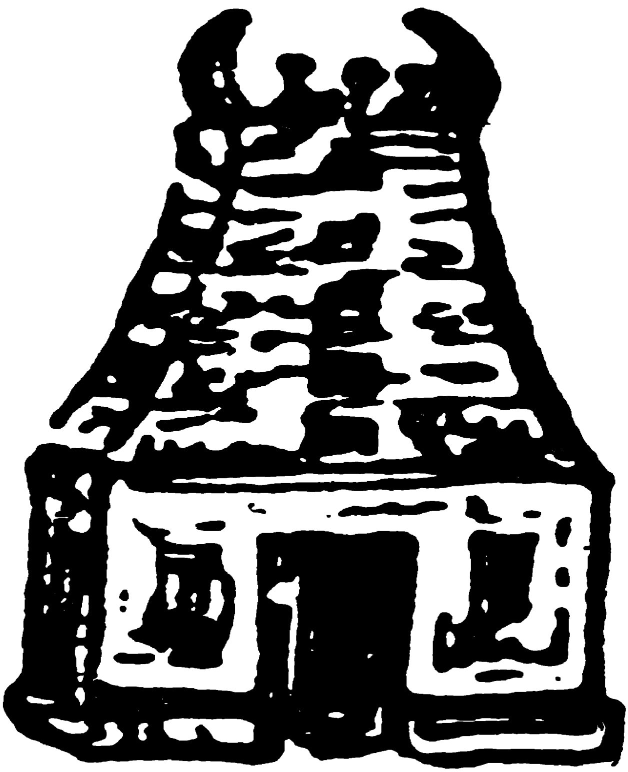
একমাত্র শ্রীক্ষেত্র ছাড়া দক্ষিণ ভারতের অন্য সবগুলি তীর্থ দর্শন হয় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দক্ষিণ ভ্রমণের এইটেই উপযুক্ত সময়। ইস্টার্ন রেলওয়ের টুরিস্ট কোচে আমরা আসন সংগ্রহ করি। এই রেলওয়ে টুরিস্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী রঞ্জিত বন্দোপাধ্যায় ছিল আমার এক নিকট আত্মীয়। তারই ভরসায় বেরিয়ে পড়ি সস্ত্রীক। সঙ্গে অবশ্য আমার ছিল দুই পুত্র পলাশ ও বিলাস আর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ অঞ্জলি ও পাঁচ বছরের নাতনী কাকলি। বন্দোবস্ত খুবই ভাল। এই ট্যুরে আমরা পুরুষ মহিলা মিলে ছিলাম প্রায় পঞ্চাশ জন যাত্রী। সকলেই হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ার পূর্বে হাতে পাই একটি করে ট্যুর প্রোগ্রাম। ম্যাপের ছক আঁকা পরিষ্কার এই চার্টটি। কখন কোন্ দিন কোন সময়, কোন্ ঠিকানায় যাব তাতে দেওয়া আছে তার একটি নিখুঁত নির্দেশনা।

ঐ টুরিস্ট কোচের তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য ছিল মূল ম্যানেজার হুগলির কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রায়। এঁর দক্ষতা ও পরিচালন ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। এ ছাড়াও ছিল নৈহাটির পলাশ মুখার্জি ক্যাটারিং ম্যানেজার। এর ওপর ভার ছিল সকল যাত্রীদের নিয়মিত জলযোগ ও দু' বেলা আহারের যত বন্দোবস্ত করা। নিঃসন্দেহে শ্রীমুখার্জি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রশংশার দাবি রাখে। বলাই ও পুলিন রান্নার লোক দু'টির পরিশ্রমের অবধি ছিল না। ঐ ম্যানেজারের মিষ্টি কথা শুনে তারা কাজ করত হাসিমুখে। আর কোচে ছিল শ্রীরামপুরের নৃপেন মুখার্জি ওয়েলফেয়ার ম্যানেজার। তারও কাজ ছিল যাত্রীদের সুখ-সুবিধা দেখাশোনা করা।

সূচী



দক্ষিণ ভারতের মন্দির শ্রীরঙ্গম



তিরুপতি

শ্রীক্ষেত্র

শ্রীক্ষেত্রের তীর্থভূমি স্পর্শ করা ভাগ্যের কথা। জগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য হল একবার। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। ১৯৪৬ সালের এক গ্রীষ্মে যাত্রা করলাম আমরা কয়েকজন মিলে পুরীধামে। রাত্রের পুরী এক্সপ্রেসে অসম্ভব ভিড়। ঠেলাঠেলি চলছে গাড়ির কামরার ভেতর। তখন রিজার্ভেশনের এত ভালো ব্যবস্থা ছিল না। তাই গুড়ের নাগরির মতো ঠোকাঠুকি করতে করতে যাত্রীদের গন্তব্যস্থানে যেতে হত।

আমরাও কোন মতে মাথা গুঁজে দিলাম। গুঁতোগুঁতির আর শেষ নেই। সারারাত্রি পেষাপেষি করে একরকম একপায়ে দাঁড়িয়ে যেতে হল। পার হল ভদ্রক ও বালেশ্বর। গাড়ির দরজা ও জানালায় ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি। ওরা বেশিরভাগই উৎকলবাসী। ভুবনেশ্বরে যখন গাড়ি এসে থামলো, তখন ভোরের আকাশ হয়ে উঠেছে বেশ লাল। চারিদিকে পাহাড়, পাথরের চাঁই। বাব্‌লা ও কাঁটাবনের কিছু গুচ্ছ মাঝে মাঝে। লাল কাঁকরের মাটির পথ দূরে গেছে চলে। দূরে ভুবনেশ্বরের মন্দিরকে এইখান থেকেই প্রণাম জানালাম। গাড়ি ছাড়ল। পার হল আরও কিছু স্টেশন। তারপর এল সাক্ষীগোপাল।

অবশেষে আমরা পুরীধামে এসে পৌঁছলাম। তখন সকাল আটটা। মস্তবড় প্ল্যাটফর্ম। লোকে-লোকারণ্য চারিদিক। সকলের সঙ্গেই আছে কিছু-না-কিছু মোটঘাট। অনেক বাঙালি পরিবার চলেছে দল বেঁধে। কেউ এসেছে হাওয়া বদল করতে, কেউবা তীর্থ দর্শনে। পুরীধাম হিন্দুদের মহাতীর্থ।

স্বয়ং চৈতন্যদেব এসেছিলেন শ্রীক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে। এই নীলাচলেই তিনি বিলীন হয়ে যান। আমরা ভিড় ঠেলে গেট পার হয়ে এসে পড়লাম রাস্তায়। বহুদিন আগেকার কথা। তখন এত রিক্সার প্রচলন ছিল না। দেখলুম বেশকিছু গরুর গাড়ি ও ঠেলা গাড়ি যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ঘোড়ার গাড়িও আছে সার সার। শুরু হল দর কষাকষি। কিছু পাণ্ডা এসে জড় হল।

আমরা অবশেষে এক পাণ্ডার শরণাপন্ন হলাম। উঠলাম মন্দিরের ধারে তাঁরই বাড়িতে। মন্দিরের সামনের রাস্তাটা খুবই চওড়া। একধারে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ বিরাট পুরীর রথ—যা দেখতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এই প্রশস্ত পথটি দেখে মনে পড়ে যায় শ্রীবৃন্দাবনের কথা। সেখানেও দেখেছিলাম এমনি একটি সুপরিবেশ। আমার মনে হল এই দু'টি তীর্থক্ষেত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

মন্দিরে ঢোকার পথ হয়ে আছে জনাকীর্ণ। বাঙালি তীর্থযাত্রীর সংখ্যা এখানে কম মনে হল না। আশেপাশে বেশ কিছু দোকানপাট নজরে পড়ল। এ যেন বসে গেছে এক মেলা। অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি ও চাতাল পার হয়ে আমরা মূল মন্দিরে প্রবেশ করলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখে মনে হল, পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এ যেন এক দুর্গ। কোন্ অতীতের সাক্ষ্য বহন করে যেন দাঁড়িয়ে আছে আজও। কত পাথরের বুকে কালো ছাপ ধরে গেছে। কোথাও বা হয়ে আছে জরাজীর্ণ। পাথরের ওপর অনেক স্থাপত্যশিল্প পড়ল নজরে। মন্দিরের দেওয়াল কার্নিশে প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন নজরে পড়ে। কত সিঁড়ি পার হয়ে আমরা এসে হাজির হলাম জগন্নাথ মন্দিরের দুয়ারে।

এখানে কেবলই মানুষের ভিড়ের ঠেলাঠেলি। পাণ্ডাদের জ্বালায় বুঝি প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমরা সেই ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়লাম অন্ধকার মন্দিরের ভেতর। শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে প্রণাম করলাম। একান্ত ভক্তিভরে মনস্কামনা জানালাম। অনেকবার মাথায়

ঝাঁটা পড়ল পাণ্ডাদের। এটা নাকি ভগবানের আশীর্বাদ। তারপর পিছনের অন্ধকার গলির পথ দিয়ে বেরিয়ে এলাম ভিড় ঠেলে। ফেরার সময় পুরীর অন্নশালাটি দেখতে ভুলিনি। একটি বড় হাঁড়ির ওপর আর একটি হাঁড়ি সাজানো। এইভাবে পরপর কয়েকটি হাঁড়িতে সমান পরিমাণে চাল জল দিয়ে তলায় উনুনের আগুনে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রতিটি হাঁড়ির ভাত নির্দিষ্ট সময়ে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ডাল, তরকারি প্রভৃতি সবই হচ্ছে। এমনি হাঁড়ি হাঁড়ি অন্নভোগ হচ্ছে প্রতিদিন। শোনা যায়, পুরীর এই রন্ধনশালার ব্যবস্থার অনুকরণে ইক্‌মিক্ কুকারের প্রবর্তন হয়েছে। এর আবিষ্কারক একজন বাঙালি।

সমুদ্র দেখার ইচ্ছে ছিল মনে প্রবল। তাই কেবলই মনটা ছট্‌ফট্ করছিল সেইদিকে। দুপুরের চান খাওয়া সেরেই মন্দিরের পাশ দিয়ে, মাটি ও খোয়ার রাস্তাটি ধরে সোজা একরকম ছুটে চললাম সমুদ্রের দিকে। দূর থেকে জলোচ্ছ্বাস ও আছড়ে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের আওয়াজ এল কানে। সীমাহীন নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম অবাক বিস্ময়ে। চারিদিকে ফুলে ফুলে ওঠা ঢেউ, নৃত্যে ও হাসিতে যেন মুখরিত। সত্যই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম প্রথম সমুদ্র দর্শনে। প্রাণভরে দেখেছিলাম সেই বিস্তীর্ণ, উৎফুল্ল জলরাশি। মাথা উঁচু করা সাপের ফণার মতো মনে হচ্ছে ঢেউগুলো। আছড়ে পড়ছে সাগর সৈকতে ; আবার পাক খেয়ে মিশে যাচ্ছে অসীম জলরাশিতে। শুধু একরাশ ফেনা তার ছড়িয়ে পড়ে বালুতটে। হু হু করে বয়ে চলে অবিরাম সাগরের পাগল বাতাস। এমনি বিরামবিহীন।

সেদিন সাগর দর্শনে তাই হয়েছিলাম বিস্ময়ে স্তম্ভিত। তারপর কতবার হেঁটেছি বালুচরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। প্রাণভরে দেখেছি প্রভাতের আকাশ—যা হয়ে গেছে টক্‌টকে লাল আবিরের মতো। সাগরের বুক থেকে সোনার থালার মতো ধীরে ধীরে উঠেছে সূর্যদেব। আবার সন্ধ্যায় দেখেছি রক্তিম, ম্লান সূর্যদেবকে সাগরের বুকে

ডুবে যেতে। এমনি প্রভাত ও সন্ধ্যায় কটা দিন কেটে গেছে একান্তে বসে সাগর বেলায়। সেই সুখময় ছবি কি ভোলা যায় কোনদিন? আজও যেন ভেসে ওঠে বারবার সেগুলি চোখের সামনে।

তারপর সহযাত্রীদের সঙ্গে কয়েকদিন বেড়িয়ে বেড়াতে হল পুরীর দর্শনীয় স্থানগুলিতে। জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ি অনেক যাত্রীই যায় দর্শন করতে। আমরাও দেখতে গেলাম সেই পবিত্র তীর্থস্থান। সামনে ডোবা, তারই পাশে একটি পুরানো পাকা জীর্ণ বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। একটি সুউচ্চ কাঠের তৈরি রথও নজরে পড়ল সেখানে। এই রথ যথাসময়ে এবং নিয়মে ফিরে যাবে আবার জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে। স্থানটি বেশ শান্ত এবং নিরিবিলি। গাছপালার ছায়ায় ভরা চারিদিক।

পুরীর সোনার গৌরাঙ্গের ছোট মন্দিরটি দেখতে কোন যাত্রীই ভোলে না। এটি সমুদ্রের ধারেই বলা চলে। তাই এই পবিত্র স্থানটি দেখে জুড়িয়ে যায় চোখ। জায়গাটি যেন নিরালায় চুপ-চাপ। এই মন্দিরটির যেন এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। আশেপাশে নজরে পড়ে বেশকিছু পুরানো ঘর-বাড়ি। কোন কোনটা হয়ে আছে একেবারেই পোড়ো। এই সমস্ত বাড়ির অধিকাংশই বাঙালিদের। বেশ নিরিবিলি সমুদ্রতীরে অবকাশ যাপনের এটি একটি উপযুক্ত স্থান। বহুপূর্বে ক্ষয়রোগাক্রান্ত রোগীরা এই সমস্ত বাড়িতে বাস করত স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। তাদের সে আশা কতটা পূরণ হত জানি না। এখানকার বালিতে কান পাতলে হয়তো এখনও শুনতে পাওয়া যাবে, তাদের অনেকের শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ। আজও যেন এক চাপা বেদনা লুকিয়ে আছে কোথাও কোন পাথরের স্মৃতিফলকে।

দূর আকাশ শেষ সূর্যের আলোয় লাল। সীমাহীন সাগরের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে ম্লান রক্তিম আলোর রেখা।

আমরা পা বাড়ালাম সমুদ্র থেকে যে পথটা চলে গেছে সোজা স্টেশনের দিকে। পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াঘন বিশাল গাছের

সারি। সরকারী দু'-একটি সুউচ্চ বাড়ি নজরে পড়ে। পাশের একটি পথ ঘুরে চলে গেছে বাজারের দিকে। এখানে বেশকিছু দোকানপাট নজরে পড়ে। নানাপ্রকারের পণ্যসামগ্রী এখানে বিক্রি হচ্ছে। খেলনার দোকান ও হরিণের চামড়ার তৈরি জুতোর দোকানের দিকে আমরা কেউ কেউ এগিয়ে যাই। কেনা-কাটা করি কিছু কিছু।

এবার ফেরার পালা। শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডাদের প্রাপ্য মিটিয়ে পরের দিন আমরা পুরী থেকে বিদায় নিলাম।

সীমাচলম্

খুরদারোড ষ্টেশনে আমাদের রিজার্ভ কোচটা কেটে দেওয়া হল। তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে। আমরা ট্রেন থেকে নেমে বড় প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলাম। বেশ ভালোই লাগছিল জায়গাটা। সারা হল সকালের প্রাতরাশ। এই প্ল্যাটফর্মের ওপর বড় বড় হাঁড়িতে আমাদের দুপুরের রান্নার আয়োজন চলতে লাগল। সঙ্গে সুদক্ষ রান্নার লোক থাকায় এ বিষয়ে আমাদের কিছুই ভাবতে হচ্ছে না। খাওয়ার পর্ব শেষ হতেই আমাদের কোচ আবার জোড়া হল।

এবার আমাদের যাত্রা ওয়ালটেয়ারের দিকে। ট্রেন চলছে। সময় পেরোচ্ছে। মাঝরাতে বাইরে তাকিয়ে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভোর হল। ঘুম ঘুম চোখে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি ছবির মতো স্টেশন। সবুজ উঁচু পাহাড়ে যেন ষ্টেশনটি ঘেরা। এককালে ওয়ালটেয়ার ছিল ইংরেজদের হাওয়া বদলের স্থান। কিশোর বয়সে শুধুই শুনেছি এর কথা। স্বপ্নে ঢাকা ছিল ইংরেজদের এই মনোরম পর্যটনের স্থানটি।

তাই জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় বারবার খুঁটিয়ে দেখে নিলাম ওয়ালটেয়ারের পথ-ঘাট, বাড়িঘর ও অভিনব স্থানগুলি—যা বহুদিন ধরে আজও অতীতের কত স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সকালের প্রাতরাশ সেরে, আমরা ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনের সামনে থেকে বাসযাত্রা শুরু করলাম সীমাচলমের দিকে। মাত্র দেড়-দু' ঘণ্টার পথ। নজরে পড়ে কিছু ঝোপঝাড় ও ছোট ছোট পাহাড়। হু-হু করে এগিয়ে চলল আমাদের বাস। ফিকে সোনালী রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা এসে হাজির হলাম সীমাচলম্ পাহাড়ের তলায়। পাহাড়ের গা বেয়ে মন্দিরের ওপর ওঠার সিঁড়ি। কত তীর্থযাত্রী চলেছে সেই হাঁটা পথে। আমরা কিন্তু দল বেঁধে বাসের টিকিট কেটে, ঘোরানো পাহাড়ী পথ ধরে উঠে এসে হাজির হলাম নরসিংহ মন্দিরের সিঁড়ির মুখে। বড় সিঁড়ির পাথরের চাতাল পার হয়ে এলাম আরও ওপরে উঠে। খানিকটা ফাঁকা জায়গায় যেন বসে গেছে মেলা। পাথরের থালা, বাটি, লোহার খুন্তি, কড়া, কাঠের খেলনা প্রভৃতি কেনার ধুম পড়ে গেছে যাত্রীদের। তখনও শেষ হয়নি মন্দিরের পূজা। টোড়ী ও ভাঁয়রো রাগে সানাইয়ের বাজনা কানে আসে। তারই মাঝে তালে তালে বেজে চলেছে মৃদঙ্গম্। সারা দেবমন্দিরটিতে যেন ভরে উঠেছে সুরের মধুর এক পরিবেশ। মন্দিরের প্রবেশপথের সামনে একটি ছোট আপিস ঘর থেকে এক টাকার গেটপাস নিয়ে আমরা ভিতরে তীর্থযাত্রীদের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম ভিতরের দিকে। নরসিংহের পাথরের খোদিত মূর্তি নজরে পড়ল। অতীতের এ এক নিখুঁত স্থাপত্য। ক্রমে সারা মন্দির প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করলাম। এরপর আমরা দাঁড়ালাম চির আকাঙ্ক্ষিত শিবলিঙ্গের পাশে। বহু যাত্রী পূজা দিচ্ছে সেই উঁচু কালো মিশমিশে শিবলিঙ্গের উদ্দেশ্যে! আমরাও দিলাম আমাদের পূজার ডালি দেবতার স্থানে। হাতজোড় করে জানালাম মনের একান্ত অভিলাষ। তারপর চারিদিক খুঁটিয়ে দেখলাম সেই পুণ্য পবিত্র দেব-প্রাঙ্গণটি। এরপর বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে।

এবার আমরা পবিত্র দর্শনীয় শিলাখণ্ডের দিকে এগিয়ে চললাম। যেদিকে তাকাই শুধু নিরালা ও বনছায়া। শিলাখণ্ডের স্তূপে ভরা চারিদিক। ভিখারি আর ফকিরের দল রাস্তার দু'-ধারে হাত পেতে বসে আছে। আমরা সকলেই তাদের হাতে কিছু-না-কিছু পয়সা দিতে থাকলাম। শিলাখণ্ডের মাথায় জল দেওয়া একটা পুণ্যের কাজ। ঘুরে ঘুরে চারিধার আমরা দেখলাম। যেন পবিত্র নিরালায় ঘুমিয়ে আছে নিশ্চুপ সীমাচলম্। এবার আমাদের ফেরার পালা। সবাই দল বেঁধে পাথরের অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম তলায়। খানিকটা ফাঁকা জায়গা। কাছেই দাঁড়িয়ে বাস। আমরা তীর্থযাত্রীরা এমনি একটি বাসে উঠে পড়লাম। হু-হু করে বাস ঘুরে ঘুরে নেমে এল সীমাচলমের পাহাড়ী পথ দিয়ে। ঠিক তলায় আছে কিছু ঘর-বাড়ি আর দোকানপাট। চারিদিক তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সারা জায়গাটা যেন ঘিরে আছে মাথা উঁচু করা পাহাড় দিয়ে। এবার বাস বদল করে আমরা ওয়ালটেয়ারের দিকে যাত্রা করলাম। ওয়ালটেয়ারের ষ্টেশনের কাছে যে জায়গাটায় আমরা আস্তানা গাড়লাম, নিঃসন্দেহে বলা যায় মনোরম। পরিচ্ছন্ন, সাজানো দোকানপাটের সারি। কলকাতার চেয়ে এখানে সবকিছুরই দাম একটু বেশি।

এবার বাসে চেপে আমরা ওয়ালটেয়ার সি-বিচের দিকে রওনা দিলাম। দৃষ্টিপথে নজরে পড়ে বড় বড় অট্টালিকা, রেস্তোরাঁ এবং হোটেল। আমরা যখন সি-বিচে এসে হাজির হলাম, তখন দুপুরের রোদ বেশ চড়া। এবার চিক্‌চিকে বালির মাঝখানে আমাদের লাল ট্যুরিষ্ট বাসটা এসে ব্রেক কষল। যেদিকে তাকাই শুধুই নীল জলরাশি। অনন্ত নীল দিগন্তে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

বঙ্গোপসাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালুতটে বারবার। দূর সাগরের বুক থেকে হু-হু করে ছুটে আসছে শীতল বাতাস। এমনি ঠাণ্ডা মন মাতানো বাতাস জুড়িয়ে দিল সারা শরীরটাকে। আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ ছড়িয়ে থাকা স্তূপাকার পাথরের বুকে। অবিরাম

চলছে এই ঢেউয়ের খেলা। আমরা সে দৃশ্য তাকিয়ে দেখলাম অবাক বিস্ময়ে। আনন্দের আতিশয্যে কতবার ছোটাছুটি করলাম চিক্‌চিকে বালিয়াড়িতে।

সামনে পার্কে অতি মনোরম ফুলে ফুলে ভরা গাছগুলি নজরে পড়ে। সবুজ ঘাসের প্রান্তর দেখে চোখ জুড়োয়। কে না চায় সেখানে দুদণ্ড থমকে দাঁড়াতে ? কত ভ্রমণবিলাসীর দল এখানে এসে সৌন্দর্য উপভোগ করে। দূরে ও সামনে লোহার বাঁধানো জেটি। কত মাল ওঠানামা করে সেখানে প্রতিদিন। দু'-একটি বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে দূর সাগরে। যাই হোক ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রসৈকত দেখে খুবই আনন্দ পেলাম। তারপর কৌতূহলী চোখ দু'টি নিয়ে ফেরার পথে দেখে নিলাম কত আকর্ষণীয় বাড়িঘর, পথপ্রান্তর। বিলাসিতার এক চরম নিদর্শন নজরে পড়ে। আমরা আবার ফিরে এলাম ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে। আমাদের রিজার্ভ কোচটা কাটা ছিল সাইডিংএ। এবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে তিরুপতির দিকে।

তিরুপতি

রেনীগুন্টা দক্ষিণ ভারতের একটি নামকরা জংশন ষ্টেশন। এখান থেকে গাড়ি বদল করে যেতে হয় তিরুপতি দর্শনে। আমরা তীর্থযাত্রী দল সকাল না হতেই ট্রেনে এসে পৌঁছলাম এই ষ্টেশনে। ওভারব্রিজ পার হয়ে ওপারে গেলাম। লোকাল ট্রেনে চাপতে হবে। তীর্থযাত্রীতে গাড়ি ভরে গেছে! বেশিরভাগ যাত্রীই তিরুপতির। বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রী তারা। অন্ধ্র, তামিল, তেলেগু, কর্ণাটক প্রভৃতি। শুধুমাত্র আমরা কয়েকজন বাঙালি।

গাড়ি ছাড়ল ঠিক আটটায়। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। দূরে ঘনসবুজ বন ও পাহাড়ের সারি। কি এক উদাস শূন্যতায় যেন ভরে আছে চারিদিক। এক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেও ভরে আছে চারিদিক। তাই বার-বার চোখ বুলিয়ে নিলাম এই নীরব বনাঞ্চলে। মাঝে পড়ল ছোট দু'-একটি ষ্টেশন। কিছুক্ষণ এমনি চলল গাড়ি। তারপর তিরুপতি ইস্ট ষ্টেশনে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ষ্টেশনটা হয়ে উঠল লোকে লোকারণ্য। ঠেলাঠেলি আর ছুড়োছুড়ি। সবাই আগে যেতে চায় বাসস্ট্যাণ্ডে। আমরাও ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়লাম ওভারব্রিজে। ব্রিজ থেকে নামার পর বড় পিচের রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তাপার হয়ে একটু হেঁটে এসে হাজির হ'লাম বাসস্ট্যাণ্ডে।

এমনি একটি বাসের ষ্টেশন এর আগে আমার নজরে পড়েনি। লোহার রেলিং দিয়ে লাইন করে ঘেরা সমস্ত বড় বাঁধানো উঠোনের চারিদিক। মাথার ছাউনিরও কোন ত্রুটি নেই। যাত্রীর দল দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। কোন অস্বস্তি নেই, শুধুই হাসি আর আনন্দ। কী যেন একটা দেখার আনন্দে সকলেই অধীর। বুকিং কাউন্টার শেষ সীমানায়। এগুলি সবই ষ্টেট পরিচালিত। পনের-বিশ মিনিট অন্তর একটি করে বাস ছেড়ে যাচ্ছে। অধিকাংশের গন্তব্যস্থল তিরুপতি মন্দিরের দিকে। আমাদের আধঘণ্টার মতো বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে হ'ল। অল্প কয়েক মিনিট পরেই বাস আমাদের নিয়ে চলল তিরুপতির পাহাড়চুড়ায়। একটি পাহাড় শেষ হতে না হতেই আর একটি এসে হাজির হয়। বাস ছুটে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। আমরা তলার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সরু কালো পিচঢালা পথে এঁকে বেঁকে, ঘুরে ঘুরে বাস ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে মোড় ঘোরার সময় যে কোন মুহূর্তে বাসটি উল্টে তলায় তলিয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ড্রাইভারের তারিফ না করে পারা যায় না। বাস ছুটে চলেছে কত পাথরের চাঙড় ও বনাঞ্চল

পেছনে ফেলে। যেদিকে তাকাই যেন সারি সারি পাহাড়ের গাঁথা মালা। ক্রমেই জঙ্গল ও গাছপালা হয়ে আসছে খুবই ছোট ও ঘোলাটে। সত্যই এ দৃশ্য দেখে অভিভূত হতে হয়। কি বিচিত্র এই প্রাকৃতিক পরিবেশ।

এভাবে প্রায় দেড়ঘন্টা বাস চলার পর আমরা উঠে এলাম তিরুপতির শেষ পাহাড়চুড়ায়। হঠাৎ আমরা গেলাম হকচকিয়ে। এ যেন এক নতুন রাজ্য। মনে হল এ যেন এক স্বপ্নের দেশ। বড় বড় বাড়ি, হোটেল, ধর্মশালা, কিছুই বাদ নেই। এখানেও বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে সার সার বাস। যাত্রীদের লম্বা লাইন পড়েছে টিকিট সংগ্রহের জন্য। যাত্রী বোঝাই বাস ফিরে চলেছে তিরুপতি ইস্ট ষ্টেশনের দিকে। প্রথমে একটি ধর্মাশ্রমে আমাদের একটু ঠাঁই করে নিলাম। তারপর সবাই একরকম ছুটে চললাম তিরুপতি দর্শনে। বহু যাত্রী চলেছে ভিড় করে মন্দিরের দিকে। পথের দু'ধারে বসে গেছে মেলার মতো দোকানপাট। চুড়ি, হার, ছবি ও রকমারি খেলনার যেন শেষ নেই। এবার হাজির হলাম এসে মন্দিরের প্রবেশপথে।

এক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম, বিশাল মাথা উঁচু তিরুপতি মন্দির ও তার বিস্তৃত বাঁধান পাথরের উঠোন। চারিদিক শুধুই জনাকীর্ণ। ভক্ত ও পুজারীর ভিড়ের যেন শেষ নেই। একটি বাঁধানো পুষ্করিণীতে স্নানার্থীদের ভিড়। মন্দিরের একপাশে লম্বা লোহার খাঁচায় দাঁড়িয়ে অগুন্তি তীর্থযাত্রী। সবাই এগিয়ে চলে মন্দিরের ভিতরে ঠাকুর দর্শনের উদ্দেশ্যে। প্রতিদিনই এমনি হয় বহু ভক্তের সমাগম। তাই তিরুপতি দর্শন খুবই ভাগ্যের কথা। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক-জন সঙ্গীনধারী দারোয়ান। ওপাশের বড় আপিস ঘরে নিয়মিত হচ্ছে কাজকর্ম। ষ্টেট পরিচালিত এই ব্যবস্থায় কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এখান থেকেই প্রতিজনের পঁচিশ টাকার টিকিট ক্রয় করে, পরিবার ও পুত্রবধূসহ আমরা কয়েকজন অল্পায়াসে প্রবেশ করলাম সামনে প্রবেশদ্বার দিয়ে মন্দিরে। এইটুকু অর্থের অপচয় না করলে আমাদের কপালে হয়তো ঠাকুর দর্শন হত না।

মন্দিরের ভিতর ঢুকে যেদিকে তাকাই, সবই যেন মনে হয় অভিনব। কত যে রত্ন আভরণে ঢাকা, তার হিসাব করা কঠিন। ভিতরের বিশাল প্রাঙ্গণ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হল। পাথরের বিরাট থামগুলো রাজপ্রাসাদের মতো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। মাঝে মাঝে নানা দেব-দেবীর পাথরের মূর্তি। মনে হয় যেন জীবন্ত। কোন্ অতীতের কত সুনিপুণ ভাস্কর্যে প্রস্ফুটিত। যেদিকে তাকাই কেবলই নজরে পড়ে পাথরের দেওয়ালের গায়ে অতীতের নানা রঙের বিচিত্র শোভা। এইসব মধুর দৃশ্যে আমরা হয়ে পড়ি বিহ্বল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা এসে হাজির হলাম তিরুপতি নারায়ণের গুহা মন্দিরের প্রবেশদ্বারে। এখানে বাইরের আলো এসে খুব কমই ঢোকে। কেমন যেন কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে সব। মাঝে মাঝে জ্বলছে প্রদীপের দু'-একটি শিখা মাত্র। আমরা যাত্রীদল ক্রমেই এগিয়ে চলতে থাকি ভিতরে। লাইন এগিয়ে চলে। ঠিক মাঝখানে জ্বলছে একটি প্রদীপশিখা। তারই আলোয় ভরে আছে চারিদিক। সামনে জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠলো তিরুপতি নারায়ণের সুন্দর সোনার মূর্তিটি। মনে হল এ এক জীবন্ত দেবতা। ভক্তের দল মাথা ঠোকে সেখানে। জানাল যে-যার মনের একান্ত বাসনা। যদি ঠাকুরের কৃপায় মনোবাসনা পূর্ণ হয় এই আশায়। এই গভীর বিশ্বাস সব ভক্তজনের। পূজারী সকলের কপালে ছুঁইয়ে দিল চন্দন টিপ। দর্শন শেষে আবার আমরা সেই লাইন ধরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে মন্দিরের সেই বিরাট পাথরের বাঁধানো প্রাঙ্গণে এক এক দল যাত্রী বসে আছে এক এক জায়গায়। বহু দূরের যাত্রী তারা। দক্ষিণের এই সেরা তীর্থস্থান তিরুপতি। সকলের তাই এখানে আসার এত আগ্রহ। এখান থেকে আমাদের আরও যেতে হবে বিভিন্ন তীর্থ-স্থান দর্শনে। এখানে যা দেখার সবই দেখে নিলাম খুঁটিয়ে। পাহাড়ের মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মন্দিরগুলি দেখে নিলাম।

ডুবন্ত সূর্য দূর পাহাড়চূড়ায় যেন খানিকটা ঠেকে গেছে। লাল

আবির যেন ছড়িয়ে আছে সারা আকাশে। আমরা সেই মহামৌনীকে জানালাম বিদায়ের শেষ অর্ঘ্য। তারপর আমরা দল বেঁধে উঠে পড়লাম। এবার ফেরার পালা। আবার বাস ঘুরে ঘুরে নামতে থাকে। আমরা এবার নেমে এলাম তিরুপতি ইস্টে।

মহাবলীপুরম্

মাদ্রাজের কিছু আগে চেঙ্গলপট্টি একটি বড় রেলওয়ে ষ্টেশন। আমাদের রিজার্ভ কোচটা সেখানেই কাটা হল। আমরা তীর্থযাত্রীর দল যে-যার খুশিমতো বেড়াতে লাগলাম সেই ফাঁকা বড় প্ল্যাটফর্মের ওপর। অনেকেই সেরে নিলাম ষ্টেশনের ট্যাপওয়াটারে চান। শরীরের ক্লান্তি দূর হল বেশ চানের আরামে। তারপর দুপুরের খাওয়ার পর্ব কোচের কামরায়। মন্দ কী? অনেকেই চোখ বুঁজে একটু ঝিমিয়ে নিল বাংকের বেডিং-এ।

বেলা তিনটে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম দল বেঁধে। উদ্দেশ্য তীর্থ ও মন্দির দর্শন। বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হল চেঙ্গলপট্টি শহরে। বেশ চওড়া পিচের রাস্তা। দু'-পাশে বড় বড় বাড়ি। আর আছে হোটেল ও নানান দোকান। লোক সমাগম কম হলেও, শহরটি বেশ জমকালো ও ছিমছাম। দক্ষিণ ভারতের পথে এটি একটি আকর্ষণীয় স্থান। বার বার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি এরই আশপাশগুলি অতি কৌতূহলী হয়ে। একটি বাস রিজার্ভ করে এবার আমরা চললাম মহাবলীপুরম্। পথের দু'-ধারে কেবলই ছায়াঘন তেঁতুল গাছের সারি। এর যেন আর শেষ নেই। আমাদের বাস হু-হু করে ছুটে চলেছে, মোষের পিঠের মতো কালো পিচের রাস্তা দিয়ে। ক্রমেই পথ হয়ে এলো নিঝুম। দূরে মাথা

উঁচু কিছু পাহাড়ের সারি পড়ল নজরে। তা আবার এত দূরে—ঠিক যেন ঘন মেঘের সারি। মনে হল এ যেন এক নতুন দেশে আমরা এসে পড়লুম। বাস ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে চলেছি কত অজানা স্বপ্নের জলছবি।

প্রায় দু'-ঘন্টার পথ পার হয়ে, আমরা এসে হাজির হলাম মহাবলীপুরমে। বাস এসে থামল একটি জনবহুল বাজারের কাছে বাস-স্ট্যাণ্ডে। বেশকিছু দোকান ও হোটেল নজরে পড়ে। আমরা এবার নেমে পড়লাম বাস থেকে। একটু ঘুরে নিলাম আশেপাশে। তারপর এগিয়ে চলা।

এগিয়ে চলি সি-বিচের দিকে। দু'-ধারের পথে শুধু চিক্‌চিকে বালি। একটি পথ ধরে এগিয়ে চলি। পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রঙ্গনাথ মন্দির আমরা দর্শন করলাম। দেবমুর্তি অতি প্রাচীন। বেশ ভক্তিভরে যাত্রীরা সাজিয়ে দিল তাদের পূজার ডালি। মন্দির প্রাঙ্গণটি অতি মনোরম। বেশ নিরিবিলি ও নির্জন পরিবেশ। এখানে আমাদের কয়েকজন যাত্রী ছাড়া আর বিশেষ কাউকে নজরে পড়ল না।

এরপর আমরা পাশের ছোট পাহাড়ের ওপর প্রাচীন লাইট হাউস দেখতে চললাম। আজও এক অতীতের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এটি। বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় ওপরে। ওপর থেকে আমরা দেখলাম নীল সাগরের ঢেউ। ফুলে ফুলে ওঠা জলরাশি। ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল সারা শরীর। সত্যই অপূর্ব মনোরম বনাঞ্চলে ঘেরা নিরালা জায়গাটি। আমরা আবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম তলায়।

এখানে কয়েকটি ছোট ছোট টিন ও কাঁচ দিয়ে ঘেরা দোকান। পাথরের কালো ও সাদা, নানা ধরনের সুন্দর জিনিস ও কত রকমারি খেলনা রয়েছে তাতে। ছোট ছোট পুঁতি ও চক্‌চকে কাঁচের খেলনা নজরে পড়ে। ঐগুলি বেশিরভাগই স্থানীয় শিল্পীর হাতের তৈরি। তাই বুঝি ওর এত আকর্ষণ।

সামনেই লাল কাঁকরের পথটি ধরে একটু হেঁটে এসে পড়লাম এক

পাহাড়ী বনাঞ্চলে। প্রাচীন দিনের খোদাই করা ইতিহাস লেখা আছে এখানে পাথরের চাঙড়ের বুকে বুকে। সেও বুঝি প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। হিন্দু রাজাদের কীর্তির নিদর্শন খোদাই করা পাহাড়ের গায়ে নানা দেবীমূর্তি নজরে পড়ে। তাই এখানে পর্যটকদের আসার শেষ নেই। অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক এখানে আসেন তাঁদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে। তা ছাড়া নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ এই পাহাড়ের আকর্ষণ বড় কম নয়। প্রতি ক্ষণেই অতীত দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চিক্ চিক্ বালি মাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চললাম মহাবলীপুরমের নীল সাগরের দিকে। দু'-পাশে ঘন ঝাউ বনের সারি। পাগল বাতাস বয়ে চলেছে অনবরত। কি আনন্দের দোলায় দুলছে ঝাউ বনের পাতাগুলি। মনে হচ্ছে যেন হাত তুলে তারা আমাদের অভ্যর্থনা করছে। এ দৃশ্যে সত্যই আমরা হয়ে পড়লাম অভিভূত।

এই সেই নয়নাভিরাম মহাবলীপুরম্। সাগরবেলায় ছড়ানো বিস্তৃত বালিরাশি। কত যাত্রীই না এসে এর বুকে হেঁটে বেড়ায় আর দেখে সাগরের নীল জলোচ্ছ্বাস। প্রতি মুহূর্তে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। এখানে রাত কাটাবার ব্যবস্থাও আছে। এখানে আছে অনেক বিচ-লজ ও হোটেল। বঙ্গোপসাগরের ঢেউ কেবলই আছড়ে পড়ছে সাগরবেলায়। খুশীর মেজাজে যাত্রীদল করে চলেছে হাসি আর হট্টগোল। কত সৌন্দর্যপিপাসুদের সমাগম হয়েছে এই সাগরতীরে।

প্রাচীন সূর্যমন্দির সাগরের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বলা চলে। ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ঐ মন্দিরের পাথর প্রাচীরের অনেক দেওয়াল চুরমার হয়ে গেছে ভেঙে। এখনও দাঁড়িয়ে আছে সূর্যমন্দির অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। অনেকে আজও বিষ্ণুমূর্তিতে দেয় পূজার্ঘ্য। বারবার খুঁটিয়ে দেখে নিলাম সেই মূর্তি। কত পাথর সিঁড়ির জীর্ণ দশা নজরে পড়ে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি পাথর আর পাষাণের কোলাকুলি। কত যুগ চলে গেছে, কত সমুদ্র-তুফান এসে আলিঙ্গন করেছে—তবু অনড় নিশ্চল ঐ মহাকালের সূর্যমন্দির।

আর কিছুক্ষণ পরে হয়তো সূর্যদেব যাবে অস্ত দূর দিগন্তে, দূর সাগরের বুকে। সোনালী রক্তাভ আভায় ভরে গেছে সারা আকাশ। হু হু করে ছুটে আসছে কেবলই ঠাণ্ডা বাতাস। পাশেই একটু দূরে ঝাউ বনের ডালপালাগুলো নড়ে যেন হাতছানি দিচ্ছে।

একটু পরেই নেমে এল ধূসর সন্ধ্যা। ধীরে ধীরে চারদিক অন্ধকারে হয়ে এল আধঢাকা। এক ম্লান মৌনতায় ভরে গেল সারা অঞ্চল। কত যাত্রী ফিরে গেল। আমরাও ফেরার পূর্বে বিদায় জানালাম মহাবলীপুরমের সেই মহাতীর্থকে।

পণ্ডিচেরী

ভিল্লুপুরমে কাটে রাতের কিছুক্ষণ। ভোরের একটু পরে পণ্ডিচেরী ষ্টেশন। ঋষি অরবিন্দ আশ্রমে আমরা ঠিক দিনটিতেই এসে হাজির হলাম। আজ শ্রীমার সেন্টিনারী উৎসব। স্বনামধন্যা রমা চৌধুরীও এসে হাজির হলেন। উৎসবের আয়োজন সর্বত্র নজরে পড়ে। অসংখ্য যাত্রীদের অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা নজরে পড়ে। আমরা ঘুরে ঘুরে আশ্রমের সমস্ত কিছু দেখতে থাকি। বহু পুরাতন আরামকেদারাগুলিতে অতীতে বহু গুণীজন এসে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করতেন। ষ্টেশন থেকে আশ্রম মাত্র এক মাইল পথ। রিক্সাওয়ালা নতুন যাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় চারগুণ ভাড়া আদায় করে নিচ্ছে। ষ্টেশন থেকে আশ্রমের পথটি অতি মনোরম।

আমরাও দু'-চোখ ভরে দেখে নিলাম ফরাসীদের শহর। সেই অতীতের পণ্ডিচেরী। কোর্ট, কাছারি, ও ব্যাঙ্ক বিল্ডিং সবকিছু পড়ে নজরে। ঋষি অরবিন্দ আশ্রমের সামনের গেট দিয়ে শত শত যাত্রী

আনাগোনা করছে। সামনের প্রাঙ্গণে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতি বেদী। কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ঘেরা সেই বেদীতল। কত ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে আছে তার ওপর। স্মৃতির নিঃশ্বাসে কত না ঝরা পাতায় ভরে আছে সেই পবিত্র প্রাঙ্গণ। যেদিকে তাকাই শুধুই ফুলের মেলা। টবে ও মাটিতে বাহারি ফুলের যেন জলছবি। লতানে গাছে জানালার কার্নিস অতি মনোরম দেখাচ্ছে। পবিত্র স্তব্ধতা চারিদিকে বিরাজ করছে। ঘরগুলি ধূপ-দীপের গন্ধে ভরপুর। ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া। দেওয়ালে টাঙানো শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার বড় দু'টি ছবি। কত ভক্তযাত্রী সেখানে নিয়ত এসে জানায় প্রণাম। আমরাও সেই ঋষিকুঞ্জকে জানালাম অন্তরের ভক্তি ও প্রীতি। আমরা হলাম ধন্য সেই পবিত্র তীর্থ দর্শনে।

ঠিক উপরের ঘরটিতে ঋষি থাকতেন। তাঁর শয্যাটি আজও আছে তেমনি যত্নে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখে নিলাম সেই পবিত্র স্থান। সেন্টিনারি বলে তাই বিনা পয়সায় একটি করে সুন্দর তোয়ালে রুমাল পেলাম হাতে হাতে। অপরদিকে শ্রীঅরবিন্দের লেখা বই কেনাকাটার পড়ে গেছে ধুম। আমরাও দু'-একটি বই কিনে নিলাম। হাতে পেলাম মূল্যবান স্যুভেনির।

এবার একাই বেরিয়ে পড়লাম গেট পার হয়ে সামনের বড় বাঁধানো রাস্তায়। দু'-ধারেই বড় বড় অট্টালিকা। অনেকগুলিই তার আশ্রমের যাত্রীনিবাস। সারা অঞ্চলটাই যেন স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরা। এ পথ ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম। হু-হু করে সাগর-বাতাস বয়ে চলেছে অবিরাম। দূরে দিগন্ত বিস্তৃত নীল সাগর। নীল আকাশে মিশে সমস্ত কিছুই যেন হয়ে গেছে একাকার।

বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে ছড়ানো পাথর চাঙড়ে। উঁচুতে বাঁধানো ফুটপাথ আর সিমেন্টের বেঞ্চ মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট বিরাট সিমেন্টের বাঁধানো ছাতাও নজরে পড়ে। সামনে চওড়া পথটা চ'লে গেছে ওধারে। কোথাও ছায়াঘন

গাছ পথের শোভা বৃদ্ধি করেছে। পথের একধারে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ অট্টালিকাগুলি। এ পথে হাঁটতে মন খুশীতে ভরে ওঠে। আমরা কয়েকজন স্নান সেরে নিলাম ঐ পথেরই একটি স্নানাগারে। আগেই আমাদের ভোজনের জন্য টিকিট কাটা ছিল।

ঠিক দুপুরে আমরা সব যাত্রীদল হাজির হলাম আশ্রমের আহারের স্থানে। কোন চিৎকার বা কলরব নেই। সবাই চুপ-চাপ এগিয়ে চলেছে ভোজনালয়ের দিকে সারিবদ্ধ হয়ে। ভিতরে বড় হলঘরে সার সার আসন ও পিঁড়ি সাজানো। সবাই হাতে থালা নিয়ে বসে পড়ে নীরবে যে যার আসনে। পাশাপাশি বাঙালি, তামিল, তেলেগু, ইংরেজ ও নানা বিদেশী। সবাই যেন একসূত্রে গাঁথা। মেয়েরাও আছেন অনেক। বড় ছোটর নেই কোন বালাই। একথালা ভাত, পাঁউরুটি, কলা, ডাল ও তরকারি পেল সবাই। আহারের পালা শুরু হল নীরবে। কোন গোলমাল নেই, কোন অভিযোগ নেই। ভোজন পর্ব শেষ হলে, যে যার থালা-বাটি নিয়ে এগিয়ে গেল ধৌতাগারে রাখতে। গরম জলের চৌবাচ্চায় পড়ল সব থালা, বাটি, বাসন। ধোয়া সেখানে চলেছে সমানে। কয়েকজন সাদা চামড়ার বিদেশীকেও দেখা গেল বাসন মাজতে। নেই কোন ভেদাভেদ বা মান অভিমানের বালাই। একদিন নয়, প্রতিদিন একই নিয়মে চলেছে এই ভোজনশালা। এই সুব্যবস্থায় চোখ জুড়োয়, মন ভরে। দূর হয় মনের কোণে জমে থাকা কালিমা। অপার আনন্দে নেচে ওঠে মন। এই তো আশ্রম। এই তো মানবতা। ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এলাম সেইখান থেকে।

ফেরার পথে আর একবার ঘুরে বেড়িয়ে নিলাম ঐতিহ্যের স্মৃতি-বিজড়িত পণ্ডিচেরী ষ্টেশনটি। সামনে ও পেছনের কিছু জনবহুল পথেও করে নিলাম কয়েকবার হাঁটাহাঁটি। দোকানপাটে কেনাবেচাও চলছে বেশ। মনে পড়ে সামনের একটা সেলুনে বসেছিলাম কিছুক্ষণ দাড়ি কামাতে। ঠিক তারই সামনে মস্তবড় এক গির্জা নজরে পড়ে।

কতদিনের পুরানো তা জানিনা। অনেকটা সীমানা নিয়ে বাহারী ফুলের বাগান। গির্জার ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে বাজলো দুপুর বারোটা। মনে হল সেই জনশূন্য নিরালায় এক অতীত ঘুমিয়ে আছে অঘোর নিদ্রায়। ঠিক ষ্টেশনের পাশেই সেই গির্জার মস্তবড় গম্বুজটা যেন আকাশছোঁয়া। তাই কোন যাত্রীর নজর এড়ায় না সেটি। সকাল সন্ধ্যায় গির্জার ঘণ্টা যায় শোনা। মন যেন ছুটে যায় কোন্ অতীতের স্বপ্নরাজ্যে।

কেন জানিনা বারবার ঘুরেফিরে দেখেছি সেই নির্জন স্থানটি। কত অতীতের স্মৃতির নিঃশ্বাস ছড়িয়ে আছে ঐ পাথরের বাঁধানো বেদীগুলিতে। সালতারিখ দেখে বোঝা যায় দেড়শো-দু'শো বছরের চিহ্নগুলি আজও মুছে যায়নি মাটির বুক থেকে। কিছুক্ষণ কেটে গেল সেখানে। তারপর পা' বাড়ালাম আবার ষ্টেশনের পথে।

আবার একবার প্রাণভরে দেখে নিলাম পণ্ডিচেরীকে। সবুজ বনাঞ্চলের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এবার আমাদের গাড়ী চলল ভিল্লুপুরমের দিকে। তারপর ত্রিচিনাপল্লী।

ত্রিচিনাপল্লী

ত্রিচিনাপল্লী এক প্রাচীন শহর
ইতিহাস দেয় এর অনেক খবর।

আমাদের রিজার্ভ কোচটা কেটে রাখা হল সাইডিং লাইনে। তখনও দিনের আলো ফুটে ওঠেনি পরিষ্কার হয়ে। গির্জার পুরানো ঘণ্টাটা সমানে বেজে চলেছে। মস্তবড় ষ্টেশন, প্ল্যাটফর্মটা সবই প্রায় জনশূন্য। লোকেদের শুরু হয়নি তেমন কোন আনাগোনা। দুর আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলাম। ফুলে ফুলে ভরে আছে বাগান। পিচঢালা পথ

গেছে পুবে। ছায়াঘন বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সার সার। ক্রমেই বাড়তে লাগল বেলা। ষ্টেশনটা হয়ে উঠল লোকে লোকারণ্য। ষ্টেশনের পাথর প্লেটে লেখা কিন্তু নজরে পড়ল 'তিরুচিনাপল্লী।' মনে হয়, ওটা ফরাসীদের দেওয়া নাম। কারণ ঐ অঞ্চল ছিল বহুদিন ফরাসী অধিকৃত। পরে ইংরেজের দখলে যায়।

এখানেই ইতিহাসের পাতা খুলে দেখতে পাই বহুদিন ধরে কর্ণাটকে লড়াই চলে ইংরেজ ও ফরাসীতে। বহু অতীতের চিহ্ন তার ছড়িয়ে আছে পথে প্রান্তরে। ডুপ্লেক্স লেখা আছে পাথরফলকে। সারা শহরটা যেন এক অতীতের ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাইতো বহু কৌতুহলী পর্যটক এখানে আসে যায়। খুঁজে দেখে অতীতকে তন্ন তন্ন করে।

আমরা এবার দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম শহরের ভেতর। চোখে পড়ল নতুন পুরাতনের এক অভিনব মিলন। বহু প্রাচীন অট্টালিকা ও ইমারত দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে আজও। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে নতুন দিনের বহুতল বাড়িও। দেখতে ভালোই লাগে। তবে পুরানো বাড়িগুলি আমার মনকে দুর অতীতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পথগুলি বেশ চওড়া ও পরিচ্ছন্ন। দেবদারু গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে পথের দুধারে। বড় বড় বাস হু-হু করে ছুটে চলেছে। পথে লোকজনের ভিড়। দু' পাশে সারি সারি দোকান। সারা শহরটি যেন ধনসম্পদে ঠাসা। এই শহরের ঠিক মাঝেই বলা চলে মস্ত এক বাঁধানো পুকুর। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চারদিক। এতবড় পুকুর খুবই কম দেখা যায়। দীঘিও বলা চলে।

এই পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে আমরা ত্রিচিনাপল্লীর বিখ্যাত রক্ টেম্পলে এসে হলাম হাজির। একে একে অনেক ছোট পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ছোট এক পাহাড়চুড়ায়। নিত্যযাত্রীদের সেখানে চলছে ওঠানামা। এর ঠিক নীচে বিখ্যাত গণেশ মন্দির। এটি

শ্বেতপাথর ও মোজাইকের জৌলুসে অতি মনোরম, দর্শনার্থীদের ভিড় লেগেই আছে। সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে চলেছে। চারদিকে আলোর রোশনাই। সার সার যাত্রীদল পূজার্ঘ্য হাতে দাঁড়িয়ে গণেশ মন্দিরের সামনে। সকলেরই কপালে একটা করে টিপ্। ভক্ত ও পূজারীর একত্র মিলনে এখানে চলেছে গণেশ পূজা।

এই মন্দিরের ঐতিহ্য বড় কম নয়। বহু অতীতের এই মন্দির আজও অক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বহু বিদেশীর উৎপাতের হাত থেকে মান বাঁচিয়ে। বহু ধনীজনের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি এত উজ্জ্বল ও প্রাণ-চঞ্চলতায় ভরপুর। এর আগে অবশ্য আরো দু'টি বিশাল প্রাসাদের মতো মন্দির আমরা দেখে এসেছি। একটি জম্বুকেশর। অপরটি শ্রীরঙ্গম মন্দির।

যদিও সূর্যদেব মাথার ওপরে, তবুও রোদের নেই তেমন উত্তাপ। আমাদের বাস বড় রাস্তা পার হয়ে দাঁড়াল। ঠিক জম্বুকেশর মন্দিরের প্রথম তোরণের সামনে। এভাবে তিনটি তোরণ পার হয়ে, এসে পৌঁছলাম খোলা মন্দিরের প্রাঙ্গণে। যেন রাজপ্রাসাদের মতো দূরে চলে গেছে মস্ত বড় হলঘর ও বারান্দা। সবই পাথরে বাঁধানো ও নানা কারুকার্যখোদিত। সত্যই বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে হয় এইসব অপূর্ব শিল্পকর্ম। তাই কেবলই মনে পড়তে থাকে সেইসব অতীতের শিল্পীদের—যাদের হাতেগড়া এইসব অতুলনীয় ভাস্কর্য। বড় বড় পাথরের থাম ও প্রাচীরের যেন শেষ নেই। সুন্দর পাথরের ঘরগুলিতে নানা দেব-দেবীর মূর্তি নজরে পড়ে। আমরা এইসব দেখতে দেখতে মন্দিরের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকে নজরে পড়ল একটি লম্বা তীর্থ-যাত্রীদের লাইন। চলে গেছে জম্বুকেশরের এক অন্ধকার গুহাঘরের দিকে।

আমরা সবাই অতি সত্বর দাঁড়িয়ে পড়লাম তাদেরই পিছনে। এবার নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ কতক্ষণই বা লাগবে দেবদর্শনে? বোধহয় একঘণ্টা আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল। সেই গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ

করে কালো অন্ধকার এক জ্বলন্ত দীপশিখার আড়ালে এক প্রস্তরখণ্ডের দর্শন হল। এই হল জম্বুকেশর। মহা জাগ্রত দেবতা। ভক্তরা মাথা ঠুকে জানাল তাদের অন্তরের কামনা। আমরাও জানালাম আমাদের অন্তরের অভিলাষ। অন্তরের গভীর বিশ্বাসে মৌনী পাষাণই হয় জাগ্রত।

চারদিকে মন্দিরের আড়ম্বর ও সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা নিষ্ক্রান্ত হলাম। তখন অপরাহ্নের রক্তরাঙা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে মন্দিরের চুড়ায় চুড়ায়।

এবার আমাদের দেখতে হবে অপর একটি মন্দির 'শ্রীরঙ্গম।' কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসে চেপে আমরা এসে হাজির হলাম গন্তব্যস্থানে। এরও বিশালতা ও সৌন্দর্যের অবধি নেই। আমরা অভিভূত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম কত না রঙের জলছবি। দেব-দেবীর যেন শেষ নেই পাষাণ প্রাচীরে। বহু বারান্দা ও পাথরের থাম পার হয়ে আমরা এসে পড়লাম ঠিক শ্রীরঙ্গম মন্দিরের মাঝে। মনে হয়, এও যেন এক প্রাসাদ। দেবতামূর্তি দর্শন করলাম। ফ্ুলের ডালি ও অর্ঘ্য কত না পড়েছে তাঁর চরণে।

স্তূপাকার ফ্ুলে ঢাকা শ্রীরঙ্গম। আমরাও পূজার্ঘ্য দিলাম পরম ভক্তিতে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখে নিলাম বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণ। কত পাথরের থাম দাঁড়িয়ে আছে সার সার। বারান্দার যেন আর শেষ নেই। শিল্পীর নিখুঁত কারুকার্য ভরা চারিদিকে। ঐতিহ্যের এ এক মনোরম নিদর্শন। তখনও সন্ধ্যার শেষ রশ্মি মুছে যায়নি মন্দিরের চুড়া থেকে। শেষ আলোর ঝিলিকে পাথরের গা'গুলি করছে চিক্‌চিক্‌। আমরা পা বাড়ালাম রক্‌ টেম্পলের দিকে।

আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করছে ত্রিচিনাপল্লী। জমজমাট দোকানের কি বাহার ষ্টেশনের আশেপাশে। লোকেদের কেনাকাটা তেমনি সমানে চলেছে। আমাদের কোচটা দাঁড়িয়ে সাইডিং লাইনে। আরো কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে আমাদের যাত্রা। পাশের পুরানো

গির্জায় ঢং ঢং বেজে চলেছে দশটা। আমাদের গাড়ী চলল আরও দক্ষিণে সেই সেতু বন্ধন ও আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ 'রামেশ্বর'।

রামেশ্বরম্

রামেশ্বর সেতু বন্ধন ব্রীজ পামবান
পার হয়ে আসিলাম সাগর তুফান।

তখন রাত্রি ভোরই হবে। গভীর ঘড়ঘড় আওয়াজে আমাদের ভেঙে গেল ঘুমের শেষ আমেজ। বাইরে তাকিয়ে দেখি বিশাল সাগর তুফান। পার হচ্ছি আমরা পামবান ব্রীজ। নীচে সাগরে বিরাট পাথরের চাঙড়ের যেন শেষ নেই। তারই উপর আছড়ে পড়ছে ক্রমাগত সাগরের ঢেউ। এই কি সেতুবন্ধন? দেখে সত্যই হতে হয় অবাক। সাগর এবং পাথরের কোলাকুলি এমন খুব কমই নজরে পড়ে। গাড়ি ব্রিজের ওপর দিয়ে চলছে তো চলছেই। প্রায় পনেরো মিনিট পর আমরা পার হলাম বঙ্গোপসাগর। এ এক অভিনব দৃশ্য। গাড়ি এসে দাঁড়াল ষ্টেশনে। রামায়ণের বীর যোদ্ধা পবনদেবের নামেই হয়েছে পামবান ষ্টেশন।

তারপর কত সবুজ নাম-না-জানা গাছপালা ও ছোট ছোট ঘরবাড়ি ফেলে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। এ এক সবুজ দ্বীপের দেশ। কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে বনবাদাড় ভরা চারদিক। লোকগুলো সব কালো এবং বেঁটে।

সকাল আটটায় এসে আমরা হাজির হলাম রামেশ্বর ষ্টেশনে। বেশ জমকালো ষ্টেশন। অধিকাংশই তীর্থযাত্রী। যে যার মালপত্তর নিয়ে

এগিয়ে চলেছে সামনের গেটের দিকে। কথিত আছে রামেশ্বর নাকি দক্ষিণ ভারতের বারাণসী।

ষ্টেশনের সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। বেশ কিছু রিক্সা ও টাঙ্গা দাঁড়িয়ে সেখানে। এক্কাও আছে কয়েকটি। ভাড়া নিয়ে ধুম পড়ে যায় হাঁকডাকের। রামেশ্বর মন্দির যেতে কেউ চায় একটাকা, আবার কেউবা চায় দু'টাকা। যে যেমন পারল গাড়িতে উঠে পড়ল। কয়েকটি টিনের আচ্ছাদন রয়েছে। মস্তবড় তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগার।

দেয়ালে কয়লার আঁচড়ে লেখা রয়েছে কতনা লোক ও দেশের নাম। এইসব দেখে মনটা কেমন যেন ভাবাপ্লুত হয়ে পড়ে। শুধু মনে হয়, কত দূরের এই স্বপ্নের তীর্থভূমি। কত ভাগ্য থাকলে সমুদ্রপারের এই মহা তীর্থভূমি স্পর্শ করা যায়। অনেক দূরদেশের তীর্থযাত্রীদের চোখে পড়ল সেই আচ্ছাদনের তলায়। কেউ এসেছে ভারতের পশ্চিম অঞ্চল থেকে। আবার কেউবা এসেছে দিল্লী, জয়পুর, হরিদ্বার, ও কাশীধাম থেকে। দক্ষিণের সাগরপারের এই শেষতীর্থ দেখার বাসনা সকলের।

যাই হোক আমরাও কয়েকটি রিক্সা ও এক্কা ভাড়া করে এগিয়ে চললাম রামেশ্বর মন্দিরের দিকে। পথ বেশি নয়, হয়তো এক কিংবা দেড় মাইল। রামেশ্বর ছোট একটি দ্বীপ। এখানকার বেশিরভাগ লোকের পেশা সমুদ্রে মাছধরা। স্থানীয় গরিব বাসিন্দাদের মামুলি সব ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। কিছু একতলা পাকা বাড়িও নজরে পড়ে। তাও মনে হয় বহুদিনের পুরোনো। পথে বসেছে হাট বাজার। কেনা-কাটারও বেশ জমেছে ভিড়। বিভিন্ন প্রকারের পথচারী নজরে পড়ে। সবাই বেঁটে ও কালো। কেউ মোটা। কেউবা রোগা। রাস্তার পাশের জমিগুলো নীচু ও ভিজে। এখানকার বেশিরভাগ গাছপালাই অচেনা। সবুজ বন, বাদাড়ও কিছু আছে আশেপাশে।

আমাদের এক্কা ছুটে চলেছে মন্দিরের দিকে। আর বেশি দেরি নেই। নিকটেই মন্দির।

এবার আমরা এসে পড়লাম নীল সাগরের তীরে—যেখানে ছড়িয়ে

আছে শুধু ধু-ধু বালি। সামনে স্থির, শান্ত, সীমাহীন সাগর। চারিদিকে ছড়ানো আছে বড় বড় পাথরের চাঙড়। শান্ত ঢেউগুলি এসে কোলাকুলি করছে কত পাথরের সঙ্গে অনবরত। সামনে কিছু খোলা ফাঁকা জায়গা বালিতে ভরা। সাগরের নীল জল কানায় কানায়। কোন উত্তাল ঢেউ নেই। স্নানের কোন অসুবিধা নেই এখানে। তীর্থযাত্রীদের স্নানের ভিড়। সামনেই নজরে পড়ে নবনির্মিত একটি ধর্মশালা।

আমরাও নামলাম সাগরস্নানে। শরীরের ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল একনিমেষে। ভারী ও নোন্‌তা জল সাগরের। কিন্তু কোনও ক্ষতি হয়নি আমাদের। পরম তৃপ্তিতেই সারা হল স্নানের পর্ব। এই সাগরে কত পুণ্যার্থীদের ভিড়। এখানকার প্রথা অনুযায়ী আমরা ভিজে কাপড়েই খালি পায়ে এগিয়ে চললাম রামেশ্বর মন্দির দর্শনে। কয়েক পা একটু হেঁটেই এসে হাজির হলাম মাথাউঁচু অপূর্বসুন্দর সেই মন্দিরের তোরণের সামনে।

কত কারুকার্যশোভিত পাথরের এই বিরাট মন্দির। এ যেন এক বিরাট প্রাসাদ-দুর্গ। বিরাট গগনচুম্বী মন্দির। চারিদিক ঘেরা পাথর প্রাচীরে। যতই দেখি, ততই হয়ে যাই হতবাক্।

বাইরে সাজানো রয়েছে কিছু দোকান। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেদিকে। কেনা-কাটার যেন ধস্ নেমে গেছে। এইসব দেখতে দেখতে আমরা সোজা ঢুকে পড়লাম মন্দিরের ভেতর। নজরে পড়ে পাথরের অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত বড় বড় থাম আর বারান্দা। হেঁটে ও দেখে, যেন শেষ করা যায় না সেইসব মনোরম দেবতাশ্রমগুলি। পাথরের মাথায় ও প্রাচীরের গায়ে রামসীতার ও আরও কত দেবতার রঙিন চক্‌চকে মূর্তি। ঘুরে ও দেখে যেন শেষ করা যায় না।

ক্রমে আমরা রামেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের দ্বারে এসে হলাম হাজির। এখানে ভিড়ের ঠেলাঠেলি। ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের পড়েছে ঘুরে ঘুরে মস্তবড় লাইন। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরাও যাত্রীদের পিছনে। ধীরে ধীরে পৌঁছলাম এসে দ্বারে। দর্শন হল রামেশ্বরমের। পূজার্ঘ্য

চাপিয়ে দিলাম শিবলিঙ্গের মাথায়। মনে মনে জানালাম কিছু অভিলাষ। জানিনা সেগুলি পরে পূর্ণ হয়েছিল কিনা। তবু বলি সেই স্থানমাহাত্ম্যের কথা অনস্বীকার্য। কত ভক্ত তীর্থযাত্রী প্রতিদিন এখানে এসে মাথা ঠুকছে এর শিলাখণ্ডে। কত যুগ ধরে এখানে চলছে এইভাবে নিত্য ভক্তিপ্রবাহ। দর্শন করলাম আরও কিছু পবিত্র দেবমন্দির। মনে হয়, এ যেন মন্দিরই নয় শুধু, যেন একটি বিরাট রাজপ্রাসাদ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এখানে আছে দু'টি শিব। একটিতে হনুমান নাকি এনেছিল কাশীর বিশ্বনাথকে। অপরটি সীতার নির্মিত বালির তৈরি শিব। যা আজ হয়ে আছে পাষাণ। এখানে পাথরের ষাঁড়টিও বিশেষ দর্শনীয়।

আমরা আবার সকলে ফিরে এলাম। সাইডিং-এ রিজার্ভ কোচে। শেষ হল ভোজনপর্ব। খাওয়ার পর ষ্টেশনের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত ঘুরে নিলাম কয়েকবার। মনের কোণে কেবলই উঁকি মারতে থাকে অতীতের পৌরাণিক ছবিটা। অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বানর সেনা নিয়ে এসেছিলেন এই দেশে সীতা উদ্ধারের জন্য। এখান থেকেই তিনি শ্রীলঙ্কায় গিয়ে করেন রাবণ বধ। তারপর হয় সীতা উদ্ধার। যদিও সাগরের ওপারে শ্রীলঙ্কা আমাদের দেখা হল না, তবুও বিকেলে সি-পোর্টের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম কেমন করে বড় স্টিমারগুলো ছেড়ে চলেছে শ্রীলঙ্কায়। ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটারের বেশি পথ নয়। পিলগ্রিম সার্টিফিকেট না হলে ওখানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

অপরাহ্নে এবার আমাদের যাত্রা শুরু গন্ধমাদন পাহাড়ের দিকে। আমাদের এক্কা ছুটে চলে মাটির পথ এবং ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। পাঁচ-ছ মাইল পথ হবে। জায়গাটি অতি মনোরম। এইখানেই নাকি ভরতের বাণের আঘাতে মহাবীর হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় মাথায় নিয়ে হয়েছিলেন কুপোকাৎ। এই পৌরাণিক কাহিনী আজও এখানে এসে শোনে বহু তীর্থযাত্রী। আমরা ভক্ত তীর্থযাত্রীদল বারবার শ্রীরামচন্দ্রের

চরণ স্পর্শ করি। প্রদক্ষিণ করি মন্দিরপ্রাঙ্গণ। কিছু ফুল আর মালা রেখে আসি সেই পবিত্র স্থানে।

রামেশ্বর দ্বীপের সেই উঁচু জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে দূরে নজরে পড়ে সাগরের নীল জলরাশি। এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় রামেশ্বর দ্বীপের অনেকটা অংশ। ফাল্গুনের সন্ধ্যায় আকাশের পশ্চিমদিকটা আবিরের মতো হয়ে গেছে লাল টক্‌টকে। ধীরে ধীরে গোধূলি নেমে আসে লাল-হলুদ শাড়ি পরে। আমরা শুধুই বিস্ময়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম বিশ্ব-নিখিলের ফুলরাঙা মালাবদল। তারপর ক্রমেই ঘন হয়ে এল ধূসর ছায়া সারা অঞ্চল ঘিরে। আমাদের এক্কাগুলি দাঁড়িয়ে ছিল সার সার। সেখান থেকে যখন ফিরলাম আমরা তখন প্রায় আঁধার নেমে এসেছে।

মাদুরা

সুদূর অতীতে কিশোর বয়সে ইতিহাস ও ভূগোলে পড়েছিলাম মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের কথা। বইয়ের পাতাতেও দেখেছিলাম তার সুন্দর ছবি। দেখেছিলাম মন্দিরের বুকে হাজার দেবদেবীর মনোরম মূর্তি। সুবিশাল সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণের মাঝে তেমনি সুন্দর সুউচ্চ চূড়াটি। আমি কি জানতাম, আজ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় সেই মাদুরার মন্দিরের সামনাসামনি হব? দেখছি কত ভক্তযাত্রী স্নান করছে সেই পবিত্র জলে। অতীতে যা ছিল স্বপ্নে ঢাকা, এখন বাস্তবে তা চাক্ষুষ দেখছি।

ঠিক ভোরের দিকে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল মাদুরাই ষ্টেশনে। রিজার্ভ কোচটা কেটে রাখা হল রেললাইনের একপাশে। দু'দিন কেটে গেল ঐ মাদুরাই জংশনে। বেশ বড় নামকরা ষ্টেশন। চারিদিক লোকে

লোকারণ্য। সারা প্ল্যাটফর্ম জনকলরোলে হয়ে উঠেছে মুখর। রকমারি দোকান আর স্টলের বাহার নজরে পড়ে। কালো পোশাকে রেল কর্মীদের ঘোরা-ফেরা করতে দেখি। সবসময়ে যেন তারা যাত্রীদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। বড় বড় কাঠের প্যাকিং বাক্স ভর্তি সি-ফিশ নজরে পড়ে। মাছের গন্ধ নাকে এসে লাগে। মনে হয়, এগুলি কাছেই কুইনাল পোর্ট থেকে এসেছে। এখান থেকে আবার চালান যায় অন্যত্র।

ষ্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা ও খোলামেলা। বাঁধানো মস্তবড় প্রাঙ্গণের একধারে সার সার বাস ও অপরদিকে রিক্সার সারি দাঁড়িয়ে। আর আছে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। যাত্রীদের ভিড় যথেষ্ট থাকলেও শৃঙ্খলা আছে। ক্রমাগত রিক্সা, বাস ও ট্যাক্সি যাত্রীবোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে।

এমনি একটি রিক্সায় আমরা চেপে বসলাম। একটু এগিয়ে এসে পড়ল কালো পিচের চওড়া রাস্তা। এবং এসে পড়লুম চৌমাথায়। দু'ধারে রকমারি দোকান ও পাকা বাড়ির সারি। লোকে লোকারণ্য চারিদিক। এককথায় বলা চলে বেশ জমজমাট ভিড়েঠাসা শহর। পূর্বদিকের রাস্তা ধরে রিক্সা এগিয়ে চলল। চোখে শুধুই দেখার কৌতূহল। অন্ধ্র, তামিল, তেলেগুই সব পথচারী। আমরা ক'জনমাত্র বাঙালী। বিভিন্ন জাতির সমাগম সত্ত্বেও কিন্তু বিদেশ মনে হচ্ছে না। বোধহয় তীর্থক্ষেত্রে এমনটি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনবহুল পথ পার হয়ে এসে পড়লাম মীনাক্ষী মন্দিরের ফটকের সামনে। এটি একটি সুউচ্চ দুর্গতোরণ বললে ভুল হয় না।

আমরা ঢুকে পড়লাম সুবিশাল মন্দিরপ্রাঙ্গণে। পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে চারিদিক বাঁধানো পাথরের চাতাল। চারিদিক উন্মুক্ত। আধমাইল জুড়ে সারা প্রাঙ্গণ। চারিদিক ঘেরা উঁচু পাথর পাঁচিলে। তারই পাশে কিছু সবুজ গাছের বনছায়া। হতবাক বিস্ময়ে এরই মাঝখানে তাকিয়ে দেখতে হয় সুবিশাল ও সুউচ্চ দক্ষিণ ভারতের মীনাক্ষী মন্দিরটিকে। কোন্

অতীতের সুনিপুণ কারুকার্যশোভিত পাথরের দেবদেবী ঘুমিয়ে আছে এর বুকে। বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দক্ষিণধারের একটি বড় প্রবেশদ্বার দিয়ে এগিয়ে চলেছে কত তীর্থযাত্রী। আমরাও তাদের সঙ্গে প্রবেশ করলাম চক্‌চকে মোজাইক করা লম্বা পাথরের বারান্দায়। কত বিচিত্র রঙচঙে ছবি আঁকা মাথার উপরের দিকে। ভিতরে এক-একটি ঘরে আছে এক-একটি বিশেষ দেব-দেবীর মূর্তি। লম্বা হলঘর আর বারান্দার যেন শেষ নেই। কোন কোন জায়গায় বেশ লম্বা লাইন পড়ে গেছে তীর্থযাত্রীদের। এইসব মূর্তি দর্শনের জন্য দু'-এক টাকার টিকিটও কিনতে হয়। অতীতের কত ভাস্কর্যমণ্ডিত ভেতরের এইসব দেবদেবীর মন্দির। শুধু দেখে হতে হয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত। ঠাকুরের মহিমাও তো কম নয়। তাই বুঝি প্রতিদিন এখানে এত ভিড় দর্শনার্থীদের।

এবার এসে আমরা হাজির হলাম ঠিক মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের প্রবেশদ্বারে। এখানেও প্রশস্ত পাথরের চাতাল। সার সার দাঁড়িয়ে আছে ভক্ত ও যাত্রীর দল। দূর থেকে দেখা যায় ছোট মন্দিরটি। সবাইয়ের লক্ষ্য সেইদিকে। হাতে পূজার ডালি নিয়ে আমরাও একটি লাইনে এগিয়ে চলেছি। ধীরে ধীরে এসে পৌঁছলাম মূর্তিটির ঠিক সামনে। মিশমিশে কালো পাথরের মীনাক্ষী দেবীর মূর্তি। মনে হয়, ঔজ্জ্বল্যে ভরা সাক্ষাৎ দেবী। চোখের জীবন্ত দৃষ্টি যেন সকলের দিকে। কত ভক্তজন তাঁর পাশ দিয়ে অবিরাম হাত জোড় করে চলেছে। পূজারী সকলের কপালে পরিয়ে দিচ্ছেন হোমের টিপ। এক জ্বলন্ত দীপের শিখায় আমরা আরও ভালো করে দেখে নিলাম দেবীর মূর্তি। পূজার অর্ঘ্য দিয়ে জানালাম একান্ত মনের বাসনা। কেন জানি মনে হল এ এক চরম সার্থকতা তীর্থদর্শনের।

এবার আমরা এসে দাঁড়ালাম এক বিরাট প্রশস্ত পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণে। এখানে লোকের ভিড় বেশ। ঠিক সামনের সুন্দর পুকুরটি দেখে চোখ জুড়োয়। চারদিকে বাঁধানো সিঁড়ি, একটি একটি করে

নেমে গেছে তলায়। স্নানার্থীর ভিড়ে ভরে আছে চারপাশ। তেমনি কাঁচের মতো তরতর করছে পুকুরের জল। ওখানে স্নান করলে নাকি পুণ্যলাভ হয়। কেউ ভিজে কাপড়েই চলে যাচ্ছে মন্দিরে পুজো দিতে। এত পুণ্যার্থীর সমাগমে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমরা কিছুক্ষণ সেইখানে ঘুরে বেড়ালাম। এত অল্প সময়ে কতটুকুই বা তার দেখতে পেলাম। কেবলই মীনাক্ষী মন্দিরের চূড়া দেখি, তবু যেন মেটে না আশা। অতীতের পৌরাণিক চিহ্ন এর বুকে। কতটুকুই বা তার খোঁজ নিতে পারলাম ?

বিরাট মন্দিরপ্রাঙ্গণ পার হয়ে এসে পড়লাম সামনের বড় রাস্তায়। ঠিক গেটের পাশেই মস্তবড় কাপড়ের দোকানটায় আমরা রেখে গিয়েছিলাম 'শ্রীচরণেষু'। অবশ্য এরজন্য খরচ লাগেনি কিছু। সেই দোকানে মাদুরার বিখ্যাত শাড়ি, লুঙ্গি, চাদর প্রভৃতি দেখতে লাগলাম। দোকানের মালিকের ব্যবহার খুব সুন্দর। বাঙালি ক্রেতাদের প্রতি তাদের আকর্ষণও যেন একটু বেশি। নজরধরা কয়েকটি জিনিস কেনা হল সেখান থেকে। হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্কটাও বেড়ে গেল। তাই সবাইকে বলি বিদেশে খরচের ব্যাপারে সংযত হওয়া দরকার। এমনি কত চোখ-ঝলসানো দোকানে সমানে চলছে কেনাকাটা।

মাদুরা শহর মোটামুটি দেখা শেষ হল। নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্দর শহর। ঘুরে-ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। অর্থাৎ সেই সাইডিং লাইনে। আমাদের রিজার্ভ কোচে। এখানেই কেটে গেল দু'-রাত। পরের দিন আমাদের প্রোগ্রাম 'কোদাইকানাল'। দক্ষিণের সবুজ বনাঞ্চলে ঘেরা সুউচ্চ পর্বতমালা। মাদুরা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে। সকাল সাড়ে আটটায় আমরা প্রায় পঞ্চাশজন এক টুরিস্ট বাসে চেপে বসলাম। বাস স্টার্ট দিল। জানালা দিয়ে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিলাম শহরের দু'-পাশের ঘরবাড়ির দিকে। কত মাথা-উঁচু অট্টালিকা এসে মিলিয়ে যায় চোখের সামনে। মোষের পিঠের মতো চকচকে পিচের পথ দিয়ে বাস ছুটে চলেছে হু-হু করে। এবার

শহরের সীমানা শেষ। পথের ছ'-ধারে ঝাঁকড়া বড় তেঁতুলগাছের সারি। এর যেন আর শেষ নেই। কিছুক্ষণ এভাবে কাটে। এবার চোখের সামনে ছ'ধারে ধু-ধু করছে খোলা মাঠ। দূরে ঝোপঝাড় আর জঙ্গল। দুরন্ত বাতাসের ঝাপটায় যেন অতিষ্ঠ হয়ে যায় প্রাণ। সঙ্গীসাথীদের আনন্দ ও হইচইয়ে বাস যেন ফেটে পড়ছে। বোধহয় ঘণ্টা ছুই পার হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম এক পাহাড়ী অঞ্চলে। যেদিকে তাকাই শুধু পাথর আর জঙ্গল। দূরে দেখা যায় কত পাহাড়ের সারি। একেবারে পাহাড়ের বুকে ঢুকে পড়েছি আমরা। ভেতরে কোথাও আলো নেই। শুধু বনাঞ্চল। এত ঘন পাহাড়ী বন হয়তো আমাদের অনেকেরই দেখা নেই। ইউক্যালিপটাস্ বনই বেশি পড়ল নজরে। এমনি একটি উঁচু পাহাড় পার হয়ে বাস আর একটি পাহাড়ের পথ ধরল। এ যেন পাহাড়ের মালা গাঁথা সার সার। দূরে কেবলই যেন পাহাড়ের ঢেউ চলেছে। কোথাও বা রোদের ঝলকানি। যেন আমরা মিশে যাচ্ছি আকাশের নীল নীলিমায়। আবার কোথাও বা হারিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো। এমনি আলো-আঁধারের খেলা দেখলাম অবিরাম।

এমনি অনেকটা পথ উঠে এসে বাস এসে দাঁড়াল একটা ছোট পাহাড়ী জায়গায়। এখানে কিছু কালো বেঁটে অধিবাসী পড়ল নজরে। খুবই গরিব মনে হল এদের। বাস এসে দাঁড়ালেই তারা ছুটে আসে কিছু বেচাকেনার আশায়। কেউ এনেছে ছোলা সেদ্ধ আর পেঁয়াজ-কুঁচি। কেউ এনেছে পাকা পেঁপের ঝুড়ি। কেউবা এনেছে রুটি আর আলুরদম। আবার কারও হাতে দেখলাম বোতল ভর্তি ইউক্যালিপটাস্ তেল। দাম বেশ সস্তা। মাত্র একটাকা। যাত্রীরা অনেকেই করল কিছু-না-কিছু কেনাকাটা। এখানে এই সমস্ত জিনিস পেয়ে আমরা হলাম খুশী।

বাস ছেড়ে চলল আরও দূর পাহাড়ের চূড়ায়। ক্রমেই দেখি উপরে কালো মেঘের ছায়া ঢেকে ফেলেছে পাহাড়ের চূড়াগুলি। আমরা

প্রায় উঠে এলাম আট হাজার ফিট। এখানে রোদের আলো গেছে নিভে। চারিদিক কুয়াশায় ঢেকে গেছে। মুসৌরী পাহাড়ের মতো খানিকটা আবহাওয়া এখানে বলা চলে। বাস এসে একেবারে পাহাড়ের শেষের চূড়ায় হাজির হল। শীতের কাঁপুনি ধরে গেছে আমাদের। হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনের কথা আমাদের জানা ছিল। তাই সবাইয়েরই কাছে ছিল কিছু-না-কিছু শীতের পোশাক। পাহাড়ের নীচে তাকিয়ে দেখলে গা' শিউরে ওঠে। কি অন্তহীন গভীর খাদ। তলায় গাছপালাগুলি যেন দেখাচ্ছে ছোট ছোট খেলনা পুতুলের মতো। হাঁটতে হাঁটতে পাক খেয়ে এসে পড়লাম ঠিক কাঠের দূরবীন ঘরের পাশে। আর একপাশে ছবির মতো কাঠের কুঁড়েঘরের রেস্ট হোম।

দূরবীন ঘরের প্রবেশপত্র একটাকা। যদিও সব মেঘে ঢাকা, তবুও বিরাট টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা গেল দক্ষিণের দূর দিগন্তের কত না অঞ্চল। এবার আমরা পা বাড়ালাম 'অ্যাসট্রো অবসারভেটরির' দিকে। চারদিকে ঘেরা কাঁটাতারের বেড়া। সরকারী নিষেধাজ্ঞা 'প্রবেশ নিষেধ।' সামনে গেটের মুখে নেপালী দারোয়ান। বিশ্বের মধ্যে নামকরা এই অবজারভেটরী। বহু মুল্যবান যন্ত্রে নির্মিত আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখবার জন্য। অনুমতি নিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম ভিতরে। সামনে কত রঙের বাহারি ফুলের গাছ। সাজানো বাগান। পাথরের সিঁড়ি গেছে উপরে উঠে। বেশ কষ্ট হচ্ছে উঠতে। আমরা এসে পড়লাম অবজারভেটরিতে। এখানকার দেখা শেষ করে নেমে এলাম তলায়। এটি একটি পার্ক। একে মনোহর বাহারী ফুলের বাগিচাও বলা চলে। বাগানটি নানাপ্রকার ফুলের গাছে সাজানো। ফুটে আছে লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি প্রভৃতি রঙের ফুল। কর্তৃপক্ষের সুরুচির তারিফ করতে হয়। এটি দেখলেই জুড়িয়ে যায় চোখ। চুপচাপ বসে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায় পাহাড় ও বাগিচায় শোভায়।

এর ঠিক বিপরীত দিকে একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান দেখতে এগোলাম। বেশ কাঁপুনি লাগছে। সরু একফালি পথ মাড়িয়ে এসে

পড়লাম একটি ফাঁকা জায়গায়। এর শেষের দিকটা ঘেরা সাদা রঙের বেড়া দিয়ে। বেড়াটি কাঠের। জায়গাটি দেখতে কৌতূহল জাগে। ঠিক তার সামনেই কালো বোর্ডে সাদা হরফে লেখা 'সুইসাইড পয়েন্ট'। তলায় তাকিয়ে দেখি গভীর খাদ। এর তলায় নিবিড় ঘন জঙ্গল। পা ফসকালে নিশ্চিত মৃত্যু। জানা গেল এখান থেকে নাকি কয়েকজন পড়ে করেছে আত্মহত্যা। তাই এই বিপদ নিশানা। সত্যই শিউরে উঠতে হয় এখানে দাঁড়ালে। একটু হাঁটার পর নজরে পড়ে প্রবল জলস্রোত পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে। এই জলস্রোত পড়ছে নীচের খাদে। প্রতিনিয়তই নেমে চলেছে এই জলোচ্ছ্বাস। অতি মনোরম এই দৃশ্য। এই জল গিয়ে পড়েছে কোদাইকানাল লেকে। চারিদিকে পাহাড় প্রাচীরের মাঝখানে এই লেকের জল বয়ে চলেছে তর-তর করে। এটিকে ঘিরে সবুজ বন-পাহাড়ের আর শেষ নেই। নিশ্চুপ এক ঘুমন্ত পুরীর মাঝে একটি বিচিত্র শোভা। এই লেকে অনেক যাত্রী নৌকাবিহারে মত্ত। নৌকোর মাঝে যুবক-যুবতীর হাসি-হুল্লোড়ের ঢেউ নজরে পড়ে। লেকের ধারে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়ায় চেপে। কেউবা তুলছে ফটো। সবই পয়সার খেলা। পয়সা খরচ করে এমন আনন্দই বা পাওয়া যায় কোথায় ? পাহাড়ের মাথায় সবুজ রঙের কাঠের বাড়িগুলি ছবির মতো দেখায়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ সোনার পাতের মতো এক ঝিলিক ছড়িয়ে যায় লেকের জলে। হিমশীতল ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগে। এই পরিবেশ মুসৌরী পাহাড় এবং নৈনিতাল লেকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এখানে রাত্রি কাটানো চলে না, বললেন বাসের ড্রাইভার। ছোট রেস্ট-হাউসে এত লোকের থাকা অসম্ভব। তাই বেলা পড়ার আগেই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এই জঙ্গল থেকে। তাছাড়া বন্যজন্তু-জানোয়ারেরও ভয় আছে। অগত্যা আমরা সকলে বাসে এসে বসলাম।

ফেরার পথে সেই পাহাড়ী নিঝুম সবুজ ঘন বনাঞ্চলটি দেখে নিলাম বারবার।

মাদ্রাজ

আমরা যাত্রীরা তাও গুণে হবে জন তিরিশ। মোট-বোঝাও সঙ্গে আছে কম নয়। বেলা দুপুর তখনও হয়নি। তবু রোদের বেশ কড়া তেজ। আমরা এসে পৌঁছলাম মাদ্রাজ সেন্ট্রালে। লোকে লোকারণ্য জমজমাট ষ্টেশন। যাত্রীদের ভিড় ও কুলির হাঁকডাকে মুখর প্ল্যাটফর্ম। আমরা অনেকেই গাড়ির কামরা থেকে নেমে পড়লাম। মাদ্রাজ এক্সপ্রেসের গতি এইখানেই শেষ। আমাদের রিজার্ভ কোচটা আবার কেটে রাখা হবে অন্যত্র সাইডিং প্ল্যাটফর্মে। তাই তাড়া নেই মোটেই। শুধু ঘাম ও গরমে চানটা সেরে নিতে পারলে সবাই শান্তি পাই। বড় বড় ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে বাথরুম ও অনেক ল্যাটরিন আছে ছড়িয়ে। কলে জলের তোড়ও যেমন, মোজাইক করা ঝক্‌ঝক্‌ করছে সব তেমনি ভেতরে। বেশ আরাম করে সবাই সেরে নিলাম সেখানে চানটা। তবু বলে রাখি তেমন ভিড় বা দরজা ঠেলাঠেলি কেউ করেনি এখানে।

ঘুরে বেড়িয়ে তারপর উৎসুক হয়ে কেবলই দেখে নিতে লাগলাম কত কি? বাহারি স্টল, দোকানও পরিপাটি সাজানো কত ছবির নিদর্শন। বহুদিনের স্মৃতিবিজড়িত এই মাদ্রাজ। ইতিহাসের পাতায় এর অতীতের কত কাহিনী পড়েছি। সেই ঐতিহ্য বুকে করে আজও দাঁড়িয়ে আছে নবরূপে বিচিত্র বেশে আজকের মাদ্রাজ শহর।

আমাদের কোচটা সাইডিং লাইনে ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে রাখা হল কেটে। রান্নার লোকেরা ইতিমধ্যে হাঁড়ি কড়া বের করে শুরু করে দিয়েছে রান্নার পর্ব। অনেকেই বেডিং পেতে সেই সময় আরম্ভ করে দিয়েছে ঝিমুনি। পরে খাওয়া সেরে একটু বিশ্রামের পর কেটে গেল

সেদিন দুপুরটা।

অপরাহ্ণে সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়ল জানলা দিয়ে গাড়ির কামরায়। আর কারো মন টেকে না একটুকুও বসে থাকতে। সকলেই হইহই করে ওঠে শহরের ভেতর ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে। কিছু মেয়ে ও মহিলাও ছিল আমাদের দলে। তাদের শখ বাজারে কিছু মাদ্রাজী শাড়ি দেখবার।

যাইহোক সেই বিকেলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম শহরের ভেতরে বেড়াতে। কালো চওড়া পিচের পথ ষ্টেশনের গা ঘেঁষে গেছে দূরে চলে। আরো দু'দিকে দু'টি এমনি পথ মিশেছে চৌমাথায়। লোকে লোকারণ্য ষ্টেশনের সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। একধারে দাঁড়িয়ে কতগুলি বাস ও ট্যাক্সি। একধারে রিক্সা দাঁড়িয়ে অগুন্তি সার সার। যাত্রীদের হই-হট্টগোল হচ্ছে তেমনি। বড় রাস্তা দিয়ে চলেছে অনবরত বাস, মোটর, রিক্সা, স্কুটার ও সাইকেল। পথে পুলিশ কন্ট্রোলও আছে। পাশের ফুটপাথ দিয়ে নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ের দল চলেছে ভিড় করে। তবু বলব কলকাতা শহরের সঙ্গে তুলনা হয় না এ ভিড়ের।

ফুটপাথের উপর উঠে দেখা হল অনেক রকমের বড় বড় দোকান। চোখ ধাঁধানো কত জিনিস সাজানো রয়েছে শো-কেসে। তেমন সস্তা দাম বলে মনে হয় না কলকাতার থেকে। বেশ জমজমাট দেখবার মত মুরে মার্কেট। আমরা তাই ঘুরে ফিরে নিলাম সেখানে কিছুক্ষণ। মেয়েরা কিনে নিল পছন্দসই কিছু শাড়ি। অনেকেই কিনল বেশ মনের মত রঙিন বেড শিট। কেউবা আবার কেনে পছন্দমত লুঙ্গি। যাইহোক এমনি কেনাকাটা করে ঘুরে বেড়াতেও হয়ে গেল রাত আটটা। রাতের অফুরন্ত আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠল তামিলনাড়ুর রাজধানী মাদ্রাজ। সাজসজ্জায় এ নগরীও বড় কম নয়। তবে এ কথা কি বলা যায়—কোথায় লাগে রাতের কলকাতা?

পরের দিন সকালের প্রাতরাশ সেরে একটা ভাড়া করা বাসে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মাদ্রাজের বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে।

বাস ছুটে চলেছে হু-হু করে। চওড়া পিচের রাস্তার দু'-ধারে বহুতল কত বাড়ি দাঁড়িয়ে সার সার। আপিস, আদালত, ও কত ব্যাঙ্ক বিল্ডিং পড়ল নজরে। যতদূর দেখা যায় দেখে নিলাম প্রাণ ভরে। যত দেখি চোখে ভেসে ওঠে কোন্ অতীতের স্মৃতি। কেবলই ভাবি কত কাহিনী ঘুমিয়ে আছে এই মাদ্রাজ শহরের বুকে। ইংরেজ আমলে এখানেই এসেছিলেন বঙ্গসন্তান কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে। তিনি এখানে ছিলেনও অনেকদিন।

আমাদের বাস এসে দাঁড়াল একেবারে জু গার্ডেনের ভেতর সবুজ ঘাসের ওপর খোলা জায়গায়। গাছগাছালির ছায়ায় ঘেরা সামনের অনেকটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে বেশ ভাল লাগে। এক এক জায়গায় এক এক রকমের জন্তু-জানোয়ার। বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতি, হরিণ ও বাঁদর সবই আছে এর মধ্যে। নানা রঙের পাখিও আছে তারের বেড়ার আড়ালে। কয়েক জাতের ছোটবড় সাপ দেখা হল একটা ঘরে। তারপর কিছুক্ষণ সবুজ ঘাসের লনে বসে বিশ্রামে কেটে গেল সময়।

এবার কাছেই টিকিট কেটে দল বেঁধে ঢুকে পড়া হল পুরানো মাদ্রাজের মিউজিয়ামে। প্রথমেই নজরে পড়ে কতগুলি ফসিলের চাঙড়। বড় ছোট ও নানা রঙের, পড়ে আছে কোন্ অতীতের জগদ্দল পাথর হয়ে। গাইড একজন আছে পাশে বুঝিয়ে দিতে তার ইতিহাস। এখানে আছে অনেক প্রাচীন দর্শনীয় যুদ্ধের ছবি আর আছে তখনকার দিনের অস্ত্র, গোলা, বারুদ ও ছোট কামান। সেদিনের কত সাজসজ্জা ও রাজা-রানীর বস্ত্র ও অলঙ্কারও পড়ল নজরে। নীচে ও উপরতলায় ঘুরে কেটে গেল অনেক সময়। এখানেই হয়ে এল বেলা দুপুর। কোচে ফিরে গিয়ে সেরে নিতে হবে দুপুরের খাওয়ার পর্ব। একটু বিশ্রাম সেরে আমাদের প্রোগ্রাম সি-বিচের দিকে।

অপরাহ্ণের ফিকে সোনালী রোদ না পড়তেই আমাদের বাস ছুটে চলল 'আন্নাদুরাই পার্কে'র দিকে। চওড়া পিচের এক জনবহুল বড় রাস্তার

পাশ থেকেই শুরু হয়েছে পার্কের ভেতর যাবার পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথটা। মাঝখানে কাল চক্‌চকে পিচ আর দু'-পাশে সিমেন্টের ফুটপাথ। মাঝে মাঝে ঝাউ ও বাহারি গাছের ডালপালায় জায়গাটা মনোরম। কচি সবুজ ঘাসের লন যেন কার্পেট বিছানো। চারপাশে কয়েকটি ফোয়ারায় যেন উঠছে জলের তুবড়ি। এর মাঝখানে আন্নাদুরাইয়ের পাথরের উঁচু মূর্তিটা জ্বলজ্বল করছে।

জনগণের কত অশ্রু বেদনায় ভরে আছে এই স্মৃতিফলক। কত ফুলের মালা শুকিয়ে আছে তলার বেদীতে। প্রতিদিনই পড়ছে তাতে কত টাটকা ফুলের পাপড়ি, তোড়া ও মালা। ধূপে, দীপে ও সুগন্ধে ভরপুর হয়ে আছে এর চারিদিক। কত ভক্ত, সেবক ও পর্যটক আসছে সেই পবিত্র স্থান দর্শনে। গাছগাছালির ছায়ায় সেই জায়গাটা হয়ে আছে বড় মনোমুগ্ধকর। চোখ জুড়িয়ে যায় কত না ফুলের রঙের শোভায়। আরো একটি বিশেষ জিনিস নজরে পড়ল এখানে। কিছু নকল জানোয়ার দাঁড়িয়ে আছে গাছের আড়ালের ফাঁকে—বাঘ, ভালুক, সিংহ ও হরিণ। দেখে মনে হয় জীবন্ত। প্রথম দেখায় বোঝা যায় না যে এগুলি শুধুই পাথরের। এইসব দেখে বেশ কিছুক্ষণ হকচকিয়ে যেতে হল। আন্নাদুরাই পার্কের চারিদিক ঘুরে বেড়িয়ে আমরা সবাই মুগ্ধ হলাম।

এরপর একটু হেঁটে এসে পড়ল মাদ্রাজের আকর্ষণীয় সি-বিচ। এখানে ঘুরে বেড়াবার লোভে অনেক পর্যটক এসেছে। তখন আকাশের শেষ সীমান্তে হলুদ রাঙা আলোর জলছবির নাচানাচি চলছে। লাল টক্‌টকে থালার মতো সূর্য ডুবু ডুবু নীল আকাশের বুকে। আমরা এসে দাঁড়ালাম গোধূলির সেই শেষ রশ্মিচ্ছটা দেখতে। মাদ্রাজের বালুতটে দাঁড়িয়ে দেখা হল সূর্যাস্ত। বেশ ঘোরাঘুরি হল বালিয়াড়িতে। সাগরের বুক থেকে অনবরত বয়ে চলেছে দুরন্ত পাগল বাতাস। শরীর জুড়িয়ে গেল নিমেষে। কত যাত্রী এল আবার ফিরে গেল। ক্রমে ঢেকে গেল ধূসর সন্ধ্যায় চারিদিক। আমরা ফিরে এসে বসলাম বাসে।

কামরাজের পাথরের মূর্তিতে ফুল ছড়াতে লোকের ভিড় আর

ধরে না। তাদের দেওয়া কত ফুল আর মালা ছড়িয়ে পড়ে আছে সেই বেদীর বুকে। ভক্তরা কত এসে করছে স্মৃতিতর্পণ ধূপ ও দীপ দিয়ে। কি নীরব পবিত্র স্থান মনে হল দেখে। কামরাজের যে জনপ্রিয়তা কত তা শুধু শ্রদ্ধায় অবনত অগুন্তি জনসমাগম দেখে বোঝা যায়। এমন একটি জায়গার বিশেষ আকর্ষণে আমরা সবাই হলাম মুগ্ধ।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সেরে আমরা শেষবারের মত বাসে মাদ্রাজ শহর বেশ খানিকটা পরিক্রমা করলাম। চোখে পড়ল জমজমাট ঠাসা পাকা ঘর-বাড়ি। প্রাচীন ও নতুন ঝক্‌ঝকে বহুতল বাড়ির সব মেশামেশি। লোকের ঘেঁষাঘেষি ভিড়ও কম নয়। অনেক বাস-মোটরও ছুটে চলেছে পথে। দূরে নজরে পড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কয়েকটি পুরানো গির্জা। ঐ গম্বুজের ঘড়িতে ঘন্টা বাজে। শুনে মনে হয় ও বুঝি কোন্ অতীতের প্রতিধ্বনি।

বাস ছুটে চলে পথের মোড় ঘুরে। মসজিদের বড় থামগুলো দেখা যায় সার সার। সামনের বড় ফটকটা দিয়ে পীর সাহেব ও কত মুসাফিরের আনাগোনা। হেঁকে নামাজ পড়ে আল্লা হো বলে। আজানের করুণ সুরে ভরে যায় এর আশপাশ। মনে হয় কত যুগের এ যেন দীর্ঘশ্বাস।

কোথাও জনবহুল পথের ভিড় ক্রমেই কমে আসে। বাস এসে দাঁড়াল একটি উন্মুক্ত দেবস্থানের প্রাঙ্গণে। বেশ বড় মন্দির। ভেতরে সুনিপুণ পাথরের শিল্পকাজ। বড় থাম আর বারান্দায় ঘিরে আছে এর চারিদিক। ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম এর আমরা সবদিক। শিবলিঙ্গে পুজো দিতে ভিড় পড়ে গেছে ভক্তদের। অনেক যাত্রী ও ভক্তদের সমাগম হয়েছে এখানে। এরা সবাই বলতে গেলে দক্ষিণের লোক। বোধহয় আমরা কজন ছিলাম এখানে বাঙালি। এমনি আর একটি মন্দির দর্শন করে আমরা সেদিনের দেখার পর্ব শেষ করলাম। আর বেশি দেরি করা চলে না। সেইদিন বিকেলেই আমাদের আবার যাত্রা শুরু বাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে।

ট্রিভেনডাম

মাত্বরা থেকে বেশ কয়েকঘণ্টা লাগল কুইলান ষ্টেশনে আসতে। এটি একটি জংশন ষ্টেশন। তাছাড়া এর সি-পোর্ট বেশ নামকরা। এখান থেকে মিটারগেজ ছেড়ে, গাড়ি বদল করতে হল ব্রডগেজে। গন্তব্য এবার কেরলের রাজধানী ট্রিভেনডাম। এটিও একটি স্থন্দর রেলপথে ভ্রমণ বলা চলে। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম কত গ্রাম, হাট, বাজার এবং কত বিচিত্র পোশাকে পুরুষ ও নারীকে। এদেশের সঙ্গে যেন অনেকটা মিল আছে বাংলাদেশের। শ্যামবর্ণ ছেলেমেয়ের চেহারা দেখে যেন ভুল হয়ে যায় বাঙালি বলে। যুবতী মেয়েদের তো কথাই নেই—ঠিক যেন বঙ্গললনা। যদিও ইংরেজি ছাড়া এদের অনেক কথাই বোঝা গেল না, তবুও বলব শিষ্টাচারে এরা অনেক এগিয়ে গেছে। ভদ্রতার ত্রুটি নেই কোনখানে।

কত ছোটবড় ষ্টেশন পার হয়ে যায়। আম, জাম, কাঁঠাল ও জায়ফলগাছের ছায়াঘন বন নজরে পড়ে। অশ্বত্থ ও বটগাছও দেখা যায়। যেন মনে হয়, এ বুঝি আমারই বাংলাদেশের মাটি। ভিজে স্যাঁতসেতে ভুমি। কোথাও এঁদো ডোবায় ভরে আছে। শ্যাওলা জমা পুকুর। বাঁশ, বাঁ্যাকারি দিয়ে ঘেরা ছোট চালা। কোথাও বা খড়-বিচুলি স্তুপাকার উঠোনে। চোখে পড়ল কত ছোট নারকেলগাছের সারি। ঐ ছোট গাছগুলিতে ফলেছে অজস্র নারকেল। গাড়ির জানালা দিয়ে চুটিয়ে দেখেছিলাম কেরলের ছবি মুগ্ধ হয়ে।

বেলা তুপুরে এসে হাজির হলাম ট্রিভেনডাম ষ্টেশনে। এটি একটি জমজমাট ষ্টেশন। লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে বড় প্ল্যাটফর্মগুলো। যাত্রীদের মালপত্তরও স্তুপাকার ছড়ানো। চারিদিকে ব্যস্ততা আর

হট্টগোল। দোকানপাট ও স্টলের ছড়াছড়ি। কিছুক্ষণ বেশ দেখতে ভালোই লাগছিল ষ্টেশনটি। কয়েকজন গাইড ও পাণ্ডা এসে জুটলো। আমাদের আগে থেকেই ভার্মা ট্রাভেলসে খবর দেওয়া ছিল। ঠিক সময়ে তাদের লোক এসে আমাদের ষ্টেশন থেকে নিয়ে গেল। ট্রিভেনড্রাম শহরটি বেশ গুলজার। লক্ষ্য করলাম, শহরের ব্যস্ততা আছে কিন্তু বিশৃঙ্খলা নেই। এই শহরটি একটি স্নিগ্ধ পরিবেশের আমেজে ভরপুর। সামনের একটি স্টপেজে ফাঁকা বাসে আমরা উঠে পড়লাম। হয়তো মিনিট দশেক হবে। যাত্রীদের নিয়ে বাস ছেড়ে দিল। কেউই দাঁড়িয়ে নেই ভেতরে অথবা ফুটবোর্ডে। চাপাচাপি ভিড়ের তো কথাই ওঠে না। কলকাতার বাসে চাপার আতঙ্ক এখানে নেই। বেশ আরামেই দু' মাইলের মতো পথ বাসে চেপে ভার্মা ট্রাভেলসে পৌঁছলাম। এদের বন্দোবস্ত যথেষ্ট ভালো। তাই এখানে কোন অসুবিধে হল না। দু'টো বড় হলঘরে দেদার জায়গা। চেয়ার, টেবিল, ছোট চৌকি ও পাখা আছে তার মাঝে মাঝে। শুধু বেডিংটা খুলে পেতে ফেললেই হল। তারপর যত পারো বিশ্রাম নাও। পরিচ্ছন্নতার এখানে কোন ত্রুটি নেই। দেওয়াল ও মেঝে চক্‌চক্‌ করছে। হামেশাই লোক খাটছে এর জন্য। ম্যানেজার এসে তদারক করে যান। তাছাড়া রান্নাঘর ও স্নানের ব্যবস্থাও এখানে খুব ভালো। কম করে দশটা ল্যাটরিন তো এখানে আছেই। এককথায় বলা যায় অতীব সুন্দর ব্যবস্থা। খানিকটা বাঁধানো ও পরিপাটি উঠোন এখানে আছে। বিয়ের পার্টি এসব হলঘর ভাড়া নেয়। টাকাও দেয় বেশ মোটা। আমাদের আপাতত একরাত এখানে কাটাতে হবে। ফেরার পথে হয়তো কাটবে এখানে দু'-একরাত।

সেইদিনই আহারান্তে বেলা দু'টো নাগাদ আমরা ভার্মা ট্রাভেলের বাসে বেরিয়ে পড়লাম ট্রিভেনড্রাম শহর দেখতে। তাদেরই গাইড ছিল সঙ্গে। প্রোগ্রাম ঠিক হল পরপর। জু গার্ডেন, আর্ট গ্যালারি, এরোড্রাম, সি-বিচ প্রভৃতি আমাদের দেখতে হবে। চলতি পথে অবশ্য আমরা দেখে নিলাম সেক্রেটারিয়েট ও অ্যাসেমবলি হাউস। ঠিক হল, পরের দিন সকালে দেখা হবে এখানকার বিখ্যাত পদ্মনাভ মন্দির।

চিড়িয়াখানা দেখে কিন্তু মন ভরল না। কলকাতার তুলনায় এ যে কিছুই নয়, তা বলা বাহুল্য। পরে হাজির হলাম আর্ট গ্যালারিতে। একটি সুন্দর নিরিবিলির মধ্যে যেন ঘুমিয়ে আছে সেই ছায়াঘন প্রাঙ্গণটা। কিছু বাহারে ফুলের গাছের মেশামেশি। এমন একটি পরিবেশে মন যেন জুড়িয়ে যায়। ঠিক ওরই মাঝে আর্ট গ্যালারি দাঁড়িয়ে আছে। আর্ট গ্যালারির বাড়িটি একটা বড় সাহেবী বাংলোর মতো। ভেতরে রয়েছে নানারঙের ছবি ও আর্টের নিদর্শন। ছবির যেন আর শেষ নেই। কত শিল্পীর কত নিখুঁত আর্টের জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে এখানে। এমন একটি মনোরম পরিবেশে আমরা সবাই হলাম মুগ্ধ।

আবার বাস ছুটে চলল। পথে নজরে পড়ল সেক্রেটারিয়েট ও অ্যাসেমবলি হাউস। এই বাড়িগুলি খুব জমকালো না হলেও কিছু বিশেষত্ব আছে। এগুলিতে আড়ম্বর না থাকলেও পরিচ্ছন্নতা আছে। পথে বাস-রিক্সা চলছে অনবরত। তখন মধ্যাহ্ন বেলা। সেইজন্য ভিড়ের চাপ কম। তবু অন্যসময়েও দেখেছি গা ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় এখানে নেই কোনখানেই। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে হু-হু করে বাস চলেছে ছুটে। খোলা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। নিকটেই সাগরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগছে। বাস থেকেই দেখে নিলাম এয়ারপোর্টের মস্ত বড় রানওয়েটা। কয়েকটি প্লেন তখন ওঠানামা করছে। সাদা বকের মতো পাখনা মেলে দু'-একটি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। স্পীড কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বাস চলল পাশ দিয়ে বিমানবন্দরের দিকে। বিশ্রামঘর, টিকিটঘর ও হোস্টেল রুম সবই আমরা দেখে নিলাম দূর থেকে। এই দেখার লাভই বা কম কিসে ?

এ পথেরই সোজা এসে আমরা হাজির হলাম অ্যাকুইরিয়ামে। এসে দেখলাম সেখানে তখন বেশ ভিড় হয়ে আছে। ছোট্ট ঘেরা জায়গাটার বেশ একটা আকর্ষণ আছে। সামনে দু'-তিনটি খোলা বারান্দা আর ভিতরে কয়েকটি হলঘর। আমরাও এ ভিড়ে দাঁড়িয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করলাম। এখানে বলে রাখি ভিড় বলতে কয়েকজন লোকের

সমাগম মাত্র। কলকাতার খেলার মাঠ বা সিনেমার টিকিট কেনার মতো লাইন দেওয়া নয়। ভিতরে সার সার ছোটবড় কাঁচের জলভর্তি বাক্স সাজানো। কত রঙবেরঙের নানাজাতের মাছ এর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সি-ফিসের বহু জাতের নমুনা দেখানো হচ্ছে এইসব কাঁচের ছোটবড় জারে ও বাক্সে। ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ ভালোই লাগে কাঁচের ভিতর এইসব মাছের ঘোরাঘুরি। কোথাও দেখলাম হাঙর, কুমির ও অক্টোপাসের ছোট বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় কাঁচের বাক্সে। আরো যে কত জাতের নাম-না-জানা সি-ফিস রয়েছে লেবেল আঁটা বাক্সে তার আর ঠিক নেই। সত্যিই এটি একটি দর্শনীয় স্থান। এখানে দেখার পর্ব শেষ করে এবার আমরা এগোলাম কোভালাম সি-বিচের দিকে। তখন পড়ন্ত বেলা। বাস আমাদের নিয়ে হাজির হল শহরের বোধহয় শেষ সীমানা রাস্তায়। এখানেই ঠিক আরব সাগরের মুখে পথ গেছে ফুরিয়ে। সেখানে একটি পাথরের চাঙড়। তার গা ঘেঁষে একটি পরিচ্ছন্ন হাঁটা পথ গেছে সি-বিচের গা বেয়ে। এর পাশে ছোট ছোট সবুজ রঙের কাঠের কটেজ দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন প্রদেশের লোককে দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে সি-বিচে। এদের মধ্যে অনেক বিদেশীও আছে।

তখনো অপরাহ্ণের সূর্যরশ্মি ফুরিয়ে যায়নি আকাশ থেকে। অফুরন্ত বালিয়াড়ির বুকে চিক্‌চিক্ করছে তার স্বর্ণ-আভা। সাগরের ফুলে ফুলে ওঠা ঢেউ ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে বালিতটে। একরাশ ফেনা পাক খেয়ে উথলে উঠছে অনবরত। ছোটবড় ছেলেমেয়েদের কেবলই হুড়োহুড়ি। কত যে নারী-পুরুষের সমাগম এখানে তা গুণে আর শেষ করা যায় না।

ঐ পশ্চিমে দিগন্তে ধীরে ধীরে বিরাট চক্রাকারে স্বর্ণগোলক অস্ত যাচ্ছে। আরব সাগরে ফুলে ওঠা কত ঢেউ নিমেষে সাপের ফণা তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে অতলে। কখনও হলুদ, কখনও টক্‌টকে আবিরের মতো রঙিন দিগন্তের নীল আকাশ। বারবার তারই স্বর্ণচ্ছটা সোনার পাতের

মতো কোথাও ঢেকে দিয়েছে সাগরের নীলিমা। প্রতিমুহূর্তেই বদলাচ্ছে এই রঙের জলছবি। কি অভিনব বিশ্বপ্রকৃতির এই খেলা। সাগর-বেলায় স্তব্ধ হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে কতজন আরব সাগরের বুকে এই সূর্য অস্ত যাওয়া। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ঐ বড় সোনার থালাটা যেন টুপ করে ডুবে যায় সাগরের অতল জলে। হঠাৎ সবাইয়ের হয়ে যায় ধ্যানভঙ্গ। যেন শেষ হয়ে যায় স্বপ্ন দেখা। কোভালামে সূর্য নামে কবিতায় আমার লেখা কলিটিও শুধু মনে পড়ে যায়। তারপর আরও কিছুক্ষণ আমরা ঘুরে বেড়াই কোভালাম সি-বিচের বালিয়াড়িতে। আকাশের রঙ হলুদ থেকে হয়ে আসে ধূসর। ক্রমে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। পাশেই একটি পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। জমাট অন্ধকারের কালো পর্দায় ঢেকে যায় দিগন্তবিস্তৃত আরব সাগর।

পরের দিন সকাল আটটা হবে আমরা দেখতে গেলাম পদ্মনাভ মন্দির। এ অঞ্চলের এটি একটি বিখ্যাত মন্দির বলা চলে। বহু তীর্থযাত্রীর এখানে সমাগম হয় প্রতিদিন। যেমন এর মস্তবড় প্রাঙ্গণ, তেমনি এর মাঝে আছে আকর্ষণীয় শিল্পভাস্কর্য। সত্যই দেখে হতে হয় মুগ্ধ। পাথরের শিব ও শায়িত বিষ্ণুমূর্তি এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য। মন্দির প্রাঙ্গণ সংলগ্ন রাজবাড়িটি দেখবার মতো। যেন একটি নিখুঁত ছবি শুধু পটে আঁকা। এর মাঝে আছে একটি পাথরে বাঁধানো বড় পুকুরও। সকালের খানিকটা রোদের ঝিলিক পড়ছে সেই তরতরে জলে। যেদিকে তাকাই এর পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ে। ঠিক বড় রাস্তার বুকের ওপর থেকেই নেমে গেছে এই মন্দিরের ওঠানামার সিঁড়ি। পুণ্যার্থীর ভিড় কম নেই। ট্রিভেনড্রামের সেই বিখ্যাত পদ্মনাভ মন্দির দর্শন শেষে, আমরা আবার ফিরে এলাম ভার্মা ট্রাভেল হোমে। এখানে স্নান-আহারের পর্ব শেষ করলাম। খাওয়া সেরে এক রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে আমাদের যাত্রা শুরু হল কন্যাকুমারিকার পথে।

কন্যাকুমারিকা

ট্রিভেনডাম শহর ছেড়ে পর্যটক বাস আমাদের নিয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে সাতচল্লিশ হাইওয়ে দিয়ে। কালো পিচঢালা পথের দু'-ধারের বড় বড় ঘরবাড়ি চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষে। লোকে লোকারণ্য পথ, রিক্সা, ঠেলাগাড়ির গা ঘেঁষাঘেঁষি কম নয়। অন্ধ্র, তামিল, তেলেগু পথচারী চলেছে পথ দিয়ে। আমরা কিছু বাঙালি তীর্থযাত্রী চলেছি এই বাসে। ক্রমেই পথ হয়ে এল জনবিরল। বোধহয় শহরের এলাকা পার হয়ে এলাম। বাস এসে থামল এক চেক-পোষ্টে। অনেকেই নেমে পড়ল ক্ষণিকের জন্য ঐ অজানা জায়গায়। পশ্চিম বাংলা থেকে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে। আর কারোর ভাগ্য কি হবে এখানে আসার? তাই সব জিনিসই বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিতে হল। অনেক ঝোপঝাড়, নাম-না-জানা গাছগাছালিতে ভরে আছে আশপাশ। ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে নজরে পড়ে মাটির ঘর। মনে হয় ওখানে বাস করে ওদেশেরই জেলে মজুররা। বেঁটে, কালো কয়েকটি চেহারা এল এগিয়ে আমাদের সামনে। দেখে মনে হয় খুবই দরিদ্র তারা। অভাব তাদের এতই গা সওয়া যে তারা ভদ্রপোশাক পরা বাবুদের দেখলে ভয় পায়। কিছুই বোঝে না, কথা বলতেও চায় না। ছেলে-বুড়ো সবাই কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। এমনি কিছুক্ষণ, তারপর একরাশ পেট্রলের ধোঁয়া ছেড়ে বাস ষ্টার্ট দেয়।

হু-হু করে বাস ছুটে চলেছে যেন কত তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। ক্রমেই সবুজ বনের চিহ্ন এল মুছে। শুধুই বালির পথ ও মাঠ। দূরে দেখা যায় ঘন ঝাউবনের সারি। যেদিকে তাকাই শুধুই চিক্‌চিক্‌

করছে বালি। মিঠে ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে যায় মনপ্রাণ। বাসযাত্রীদের আনন্দ আর ধরে না। সকলের মুখে ঐ একই কথা, আর বেশি দেরি নেই সাগরতীরে পৌঁছতে। প্রায় দেড় ঘণ্টা আমরা বাসে আছি। আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের শেষ গন্তব্যস্থলে।

এবার নজরে পড়ে সীমাহীন নীল আকাশ। পাগলা বাতাস বয়ে চলেছে ক্রমাগত। কানে আসে সাগরের ঢেউয়ের ডাক। আমরা এগিয়ে চলি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত তীর্থভূমির দিকে। পথ হল এইখানেই শেষ। বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন শুধু সীমাহীন আকাশ আর সাগর-তুফানের মেশামেশি। দিগন্তবিস্তৃত নীল সাগরের ঢেউ দেখে মোহিত হয়ে যেতে হয়। ক্ষণিকের জন্য ভুলে যাই নিজের অস্তিত্ব। এই পৃথিবীর বিরাটত্বে অবাক হয়ে যাই বিস্ময়ে।

ভারতের শেষ তীর্থভূমি এই কন্যাকুমারিকা। কোন্ অজানা অতীতের পাথর প্রাচীরে ঘেরা কন্যাকুমারী মন্দির। এর চারপাশ ঘিরে বড় বড় পাথরের সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে একেবারে সমুদ্রের কোলে। এর পাশেই নতুন তৈরি সাদা পাথরের গান্ধী মেমোরিয়াল, যেখানে সাগরের ঢেউ ফুলে ফেঁপে আছড়ে পড়ছে পাথর চাঙড়ে। এখানেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিবেকানন্দ রক। মাথায় পত পত করে উড়ছে গৈরিক এক জয়পতাকা। স্বামী বিবেকানন্দ এই স্থানে দিনের পর দিন হন ধ্যানমগ্ন। পরে একদিন এই দক্ষিণাঞ্চল থেকে পাড়ি দেন আমেরিকার চিকাগো শহরে।

এই কন্যাকুমারী মন্দিরের সারা প্রাঙ্গণটির নাম দেবস্থান। এখানেই সাগরের বিচিত্র শোভা দেখার জন্য তৈরি আছে কতকগুলি ছবির মতো ঘর সার সার। তারই কতকগুলি আমরা ভাড়া পেয়ে গেলাম। এই পবিত্র চিত্তাকর্ষক স্থানের সবকিছু দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এর বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কিংবা বিছানায় শুয়ে জানালা খুললেই চোখে পড়ে উন্মুক্ত সাগরের জলোচ্ছ্বাস। বিস্তৃত নীল দিগন্ত যেন একাকার হয়ে গেছে। সামনের বাঁধানো অগুন্তি সিঁড়ি ও পাথরের চাতালে

তীর্থযাত্রীদের ভিড় আর ধরে না। অপরাহ্ণ বেলা এল গড়িয়ে। একটু পরে পশ্চিমে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাবে সূর্যগোলক।

সূর্যাস্ত দেখবার জন্য তাই ক্রমেই এখানে চলেছে ভিড় বেড়ে। ধীরে ধীরে ডুবে যান সূর্যদেব সোনালী রঙের ছটায় সাগরের অন্তরালে। শেষ বিদায়ের চুম্বনে হলুদ হয়ে যায় সারা আকাশের নীলিমা। সাগরের বুক থেকে ছুটে আসে পাগল বাতাস—ঠিক যেন উদাস দীর্ঘশ্বাস।

গান্ধী মেমোরিয়ালের সাদা পাথরের বুকে ছড়িয়ে গেল সেই স্বর্ণ-চ্ছটা। দূরে একদল হাঁস পাখনা মেলে উড়ে গেল আকাশে। বিবেকানন্দ রকের মাথায় গেরুয়া নিশানটা কেবলই উড়ছে অবিরাম ঝোড়ো বাতাসে। এক বিশাল পাথরের উঁচু চাঙড়ের বুকে দাঁড়িয়ে সে যেন হাত নেড়ে জানাচ্ছে তাকে বেলাশেষের শেষ বিদায়। ক্রমেই আঁধার এল ঘনিয়ে। জোনাকির মতো হাজার তারকা উঠল আকাশে ফুটে দেখা দিল সরু একফালি চাঁদ। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। দূরে কেবলই ফুলে ফুলে ওঠা ঢেউয়ের চলছে নাচানাচি ও মাতামাতি। সাগর ও আকাশ মিলেমিশে এখানে হয়ে আছে অনন্য। বিরাট এই বিশ্বের আকর্ষণ অনুভব করি প্রতিমুহূর্তে।

কন্যাকুমারিকার মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে। অজস্র ফুল ও ফলের অর্ঘ্য দেবীর চরণে অর্পিত হয়। ঐ ধূসর মূর্তিটি কত যুগ আগে থেকে মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে অধীর প্রতীক্ষায়। সে আশা ও প্রত্যাশা অনন্তকালের। আজও তার পতি শিবের মেলেনি দর্শন। তাই দেবী চির-প্রতীক্ষিতা।

তখনও প্রভাতের অনেক বাকি। পাণ্ডা এসে ঘরে ঘরে হেঁকে ডেকে গেল যাত্রীদের ওঠবার জন্য। দেবীর স্নানের সময় হবে না দর্শন। কর্ণাটক সুরে সানাই বেজে চলেছে মন্দিরে। গোলাপ ও আতরের জলে মূর্তিটিকে ধুইয়ে চান করানো হল। তারপর পরানো হল পরিপাটি করে সাজ। এটিও না দেখলে ত্রুটি থেকে যায়। তাই স্ত্রীর আগ্রহেই (বর্তমানে তিনি আর ইহজগতে নেই) শুধু আমার পুত্র ও পুত্রবধূসহ দেখা হল এই পুজো দু'চোখ ভরে।

তারপর ক্রমেই দিনের আলো ফুটে ওঠে এই সাগর অঞ্চলে। লোকের আর ভিড় ধরে না বাঁধানো পাথরের চাতালে, সিঁড়িতে ও মন্দির প্রাঙ্গণে। পুবের আকাশ লাল হয়ে, একটু পরেই দেখা দেবে দূর দিগন্তে সূর্যরথ। সকলের মুখে ঐ একই কথা, নজর একই দিকে। ক্রমে দূরের আকাশ হয়ে উঠলো হলুদরাঙা। আর বেশি দেরি নেই। সবাই নিশ্চল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দূর পূর্বদিগন্তে। কিছুক্ষণ পরেই একটি মস্ত বড় থালার মতো রক্তগোলক নিমেষে উঠে পড়ল সাগরের বুক থেকে। রক্তরশ্মি ছড়িয়ে পড়ল নীল উন্মুক্ত আকাশে। এর শোভায় অভিভূত হয়ে যেতে হয়। বহু পর্যটক ও তীর্থযাত্রী সেদিন মুগ্ধ হয়ে দেখল পৃথিবীর এই রঙ বদলানো। এমনি প্রতিদিন কতশত লোক এসে দেখে যায় কন্যাকুমারিকায় সূর্য ওঠা ও সূর্যাস্ত। তাই বলি আমাদের সৌভাগ্য কম কিসের?

পরদিন আমরা সবাই মন্দিরের গা বেয়ে কতকগুলি সিঁড়ি ভেঙে এসে পড়লাম রাস্তায়। পথের দু'-ধারেই ছোটবড় দোকানের সারি। যেন মেলা বসে গেছে। ঠাকুরের ছবি, খেলনা, চুড়ি, হার ও কত-না বাহারে জিনিস সাজানো এইসব দোকানে। লোকের কেনাকাটারও ভিড় এখানে কম নয়। কেনাকাটার যেন ধুম পড়ে গেছে। আমরা ঐসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম লঞ্চঘাটের দিকে।

এখানে এসে দেখি মস্ত বড় লাইন পড়ে গেছে লোকের প্রায় রাস্তায় মুখ থেকে। আমরাও আর দেরি না করে দাঁড়িয়ে পড়লাম লোকের পিছনে। কাঠের ফেনসিং দেওয়া আছে। ঘুরে ঘুরে বেঁকে চলেছে লাইন টিকিটঘরের দিকে। একটাকার টিকিট। দু'টো বেশবড় লঞ্চ অনবরত যাতায়াত করছে বিবেকানন্দ রক পর্যন্ত। যাত্রীদলের ভিড়ের আর শেষ নেই। যথেষ্ট শৃঙ্খলা আছে পরিচালন ব্যবস্থায়। সাগরের ঢেউয়ের দাপট প্রচণ্ড। ফুলে ওঠা জলোচ্ছ্বাস ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে জেটির গায়ে ও পাটাতনে। আমাদের কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে। লঞ্চ টাল খায়। এইরকম পরিবেশে আমরা মোটেই অভ্যস্ত নই।

আমরা প্রায় সকলেই হক্‌চকিয়ে যাই। এমনি ভয়-ভাবনার ভেতরে লঞ্চ এসে ভিড়ল রকে। এই সেই বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির। নীল সাগরের বুকে একটি পরিচ্ছন্ন ছবি বলা চলে। প্রথমেই চোখে পড়ে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কয়েকটি সুন্দর ছবি ও বইয়ের দোকান। কর্তৃপক্ষের পরিচালনার কোনও ত্রুটি নেই। তাই এখানকার ব্যবস্থা এত পরিচ্ছন্ন। উঠে পড়লাম উঁচু পাথরের সিঁড়ি ভেঙে। সাগরের পাগল হাওয়া আমাদের মাতিয়ে দেয়। সোজা হয়ে দাঁড়ানো মুশকিল। চারিদিকে উন্মুক্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। আর সাগরের ঢেউ।

বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির রকের উপরে উঠে দেখি এক বিরাট বাঁধানো পাথরের উঠোন। মাঝখানে একটি সিঁড়ি আরও উপরে উঠে গেছে। এটিও বেশ মজবুত এবং চওড়া। ঠিক সিঁড়ির ওঠার মুখে দু'ধারে বড় বড় শুঁড় বার করা দুটো চক্‌চকে কালো পাথরের হাতি দাঁড়িয়ে। উপরে মস্তবড় উঁচু হলঘর। যেন গম্‌গম্‌ করছে। হলঘরের শেষের দিকে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের কালো পাথরের উঁচু মূর্তি। মাথায় পাগড়ি জড়ানো সন্ন্যাসী মূর্তি। ঘরের ডানদিকে ও বাঁদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের ছবি। ভক্তরা ছবি দু'টিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে চলছে। প্রতিদিন চলে এই ভিড়ের মেলা। কত যাত্রী এখানে নিত্য আসছে কোন দুর দূরান্ত থেকে তার আর ঠিকঠিকানা নেই।

উপরের দেখা শেষ করে আমরা আবার নেমে এলাম উন্মুক্ত বিরাট উঠোনের মাঝখানে দমকা। বাতাসে দাঁড়ানো মুশকিল। গায়ের চাদর উড়ে যাচ্ছে। যাইহোক এমনি হাওয়ার দাপটে টলতে টলতে আমরা আর একদিকে এগিয়ে গেলাম। এটি একটি চারিদিক ঘেরা পাথর দেওয়ালের আড়ালে এক মস্তবড় গুহার মতো ঘর। ভিতরে ঢুকলে আর এখানে শোনা যায় না সাগরের গর্জন। নিস্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ এখানে। ধূপ, ধুনা, স্তূপাকার গোলাপের সুগন্ধে চারিদিক হয়ে আছে ভরপুর। সামনেই একটি পাথরের বেদী। এরই ওপর বসে স্বামীজী হতেন ধ্যানমগ্ন। জনকোলাহলের সঙ্গে এই স্থানের কোনও সম্পর্ক নেই। কতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি এখানে হয়ে থাকতেন ধ্যানমগ্ন।

পরে এইখান থেকে শোনা যায় দক্ষিণ দেশের কোন এক রাজার আর্থিক সাহায্যে, তিনি কোচিন বন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে যান চিকাগোর সেই বিখ্যাত ধর্মসভার উদ্দেশে। এই শিলাখণ্ডের বুকে আজও রয়েছে তাঁর পদচিহ্নের ছাপ। কত ফুলরাশি রয়েছে সেখানে ছড়িয়ে। ভক্তেরা দলে দলে এসে মাথা ঠুকছে সেই বেদীমূলে। স্থানমাহাত্ম্যে ভাববিহ্বল হয়ে যেতে হয়। এই স্মৃতিমন্দিরে কার কি প্রার্থনা জানি না। আমিও অন্তরের কামনা জানাই ঃ 'হে মহান! দূর কর অন্তরের কালিমা, আমাকে নিয়ে চল অন্ধকার থেকে আলোর পথে।'

এরই একপাশে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের ছবির মতো সাজানো বইয়ের দোকানটি। এখানেই পাথরের ছোটবড় জমানো বিবেকানন্দ ও কত মূর্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কন্যাকুমারিকায় আছে কত চোখ-জুড়ানো ছবি ও অ্যালবাম। এইসব দেখতে দেখতে যাত্রীর দল এগিয়ে যায় রকের সেই বিশাল বাঁধানো উঠোনের মাঝখানে। আকাশ আর সাগরের নীলে এর চারিদিক হয়ে আছে একাকার। দুরন্ত পাগল বাতাস এখানে বয়ে চলেছে প্রতিক্ষণ। এরই দোলায় শরীর ও মনে লাগে এক অপূর্ব আনন্দ শিহরণ। এই রকেরই মাথায় মস্ত এক গৈরিক পতাকা পত পত করে উড়ছে। যেন মনে হয় সে সগর্বে জানাচ্ছে ধর্মবিশ্বাস ও শক্তির কথা। এই তিনটি সাগরের বুকে এই পতাকা দাঁড়িয়ে আছে নির্ভীক সাক্ষী হয়ে।

এমনি প্রত্যহ কত যাত্রী আসে এই মন্দির দর্শন করতে। আবার ফিরে যায়। এবার আমাদের ফেরার পালা। ভিড়ের ঠেলাঠেলি, ও সমুদ্র ঢেউয়ে পাক খেতে খেতে লঞ্চ আমাদের নিয়ে ফিরে এসে লাগল জেটিতে। সেখান থেকে দল বেঁধে নেমে এসে পড়লাম রাস্তায়। পথটা সোজা বাজার ছেড়ে চলে গেছে মন্দিরের দিকে। এরই অপরদিকে পড়ে এখানকার শহর ও অনেক ঘরবাড়ি। ঐ গুলজার পথের মোড় পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম কন্যাকুমারী মন্দিরের দিকে। ঠিক গেটের মুখে শ্বেতপাথরের লম্বা বারান্দাটি বড় মনোরম।

এখানে যাত্রী ও পাণ্ডাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক মধুর সম্পর্ক। ফুল, মালা, নারকেল ও পূজার ডালি থরে থরে সাজানো ও বেচাকেনা চ'লছে এই পূজাপ্রাঙ্গণে। খোলা গায়ে তীর্থযাত্রীদল ঢুকে পড়ছে মন্দিরের ভেতর। অন্ধ্র, তামিল, তেলেগুরই ভিড় বেশি। যদিও আমরা ও আর কয়েকজন মাত্র ছিল বাঙালি। চারিদিকের প্রাচীর পাথর দিয়ে ঘেরা। একটু দূরে থেকে আমরা দেখলাম গ্রানাইট পাথরের ধূসর রঙের অতি সুন্দর কন্যাকুমারিকা মূর্তিটি। ঐ পাথরের আড়ালে যেন চোখে ফুটে ওঠে এক জীবন্ত মূর্তি। স্বর্ণমালা হাতে শিবের জন্য চিরপ্রতীক্ষিতা। প্রতীক্ষার যেন শেষ নেই। যুগ যুগ ধরে অনন্ত সাগরের মতো কি এক প্রত্যাশা!

এইখানেই আছে আরো কয়েকটি মন্দির। পাথরের দেওয়ালে খোদাই করা নানা সুনিপুণ ভাস্কর্য। কোন্ অতীতের তৈরি এইসব কারুকার্য জানি না। আরো কয়েকটি সুদর্শন দেবদেবীর মূর্তি দেখা হল। একেবারে সাগরগর্ভেই মন্দিরের অবস্থান। ভেতরে যেমন লোকের ভিড়, তেমনি অন্ধকার। যে-কোন সময়ে, যে-কোন যাত্রীর ঘটতে পারে চিরসমাধি।

এরপর আমরা পশ্চিমদিকে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। সাদা মার্বেল পাথরের নূতন তৈরি গান্ধী মেমোরিয়ালটিও কম দর্শনীয় নয়। ভিতরঘর, বারান্দা ও স্মৃতিবেদী সব ঝক্‌ঝক্ করছে। সকালের ঝলকানিতে সাদা দুধের মতো স্মৃতিমন্দিরটি হয়ে উঠেছে অপূর্ব শোভা-মণ্ডিত। এখানে গান্ধী স্মৃতিবেদীর পাশে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায় সেই ত্যাগী মনীষীকে। ত্যাগ, আদর্শ, ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক হিসাবে। এও এক পুণ্য স্থান। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় মহাত্মার সেই মানবতার বাণী।

গান্ধী মেমোরিয়ালের ঠিক পাশ দিয়ে একটি পথ আরো দূরে চলে গেছে পশ্চিমে। খোলা নীল আকাশ আর সাগরের অনন্ত জলোচ্ছ্বাস।

পথশোভায় হতে হয় মুগ্ধ, বিমোহিত। বহুদিনের মাথা উঁচু করা লাইট-হাউসটি আমরা দেখে নিলাম।

পরের দিন দুপুরে দেবস্থান থেকে বাস ছাড়ল ট্রিভেনডামের দিকে। যেখান থেকে মাদ্রাজ হয়ে আমরা ফিরব পশ্চিম বাঙলায়। দক্ষিণের শেষ তীর্থ কন্যাকুমারিকার কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। শেষবারের মতো চোখ ফিরিয়ে দেখে নিলাম দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। প্রণাম জানালাম কন্যাকুমারিকার মন্দিরের উদ্দেশে। এই তীর্থের আকর্ষণ কোনদিনই কমবে না। হৃদয় আমাদের ভারাক্রান্ত। পিছনের দিকে কতবার চেয়ে চেয়ে দেখেছি জানি না। বাস ছেড়ে দিল একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে। বিবেকানন্দের সেই গৈরিক পতাকাটি শুধু দেখা গেল উড়ছে বাতাসে। হাতছানি দিয়ে সেও বুঝি জানাচ্ছে শেষ বিদায়।

॥ দক্ষিণ ভারত তীর্থ ॥

দক্ষিণ ভারত তীর্থ বড় মনোরম
'নরসিংহ' মন্দির যাই সীমাচলম্।

'ওয়ালটিয়ার' হ'তে মাদ্রাজ মেলে
'রেণীগুণ্টা' ষ্টেশনে ঠিক ভোর হ'লে।

আটটার লোকাল ট্রেনে তিরুপতি ইষ্ট
বাসের লাইন পড়ে কাটতে টিকিট।

ঘুরে ঘুরে বাস ছোটে পাহাড় চূড়ায়
'তিরুপতি বালাজী' দর্শন মিলায়।

'চেঙ্গলপট্টি' হ'তে মহাবলীপুরম্
পক্ষিতীর্থ শেষ ক'রে কাঞ্চীপুরম্।

'ত্রিচিনাপল্লী' এক প্রাচীন শহর
শ্রীরঙ্গম্ মন্দির দেখে 'জম্বুকেশর'।

রাতের কিছুক্ষণ কাটে 'ভিল্লুপুরম্'
ভোরের একটু পরে 'পণ্ডিচেরী' আশ্রম।

'মাদুরা'র 'মীনাক্ষী' মন্দির বিরাট
পাথর পুতুলে আঁকা কত রাঙা আর্ট।

'মাদুরাই' থেকে বাস একশো মাইল
'কোদাইকানালে'র সাথে মুসৌরীর মিল।

সেতুবন্ধ পার হ'য়ে ব্রীজ 'পাম্বান'
পার হ'য়ে ট্রেন এল সাগর তুফান।

মন্দির দর্শন শেষে 'রামেশ্বরম্'
শ্রীরাম চরণ চিহ্ন 'গন্ধমাদন'।

মিটার গেজ শেষে এল 'কুইলান'
তারপর বড় গাড়ি ট্রিভেন্ডাম্ ষ্টেশন।

'পদ্মনাভ মন্দির' সি-বিচ্ কোভালাম্
আর্ট গ্যালারি জু আর অ্যাকুইরিয়াম্।

'কন্যাকুমারিকা' যেতে মাইল পঞ্চাশ
'৪৭ হাইওয়ে' দিয়ে ছুটে চলে বাস।

'বিবেকানন্দ রক' গান্ধী মেমোরিয়াল
'কন্যাকুমারী' মন্দির সাগর উত্তাল।

'ট্রিভেন্ডাম্' থেকে মাদ্রাজ শহর
ট্রেন এসে পৌঁছাল বিশঘন্টা পর।

'জু-গার্ডেন' 'মিউজিয়াম' শঙ্কর মন্দির
'আন্নাহুরাই' পার্কে জমে ওঠে ভিড়।

'জনতা এক্সপ্রেসে' ফেরা ফের বঙ্গদেশ
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ এই হ'ল শেষ।

ট্রেনে ৪।৩।৭৮

॥ সীমাচলম্ ॥

জনতা এক্সপ্রেস এল ওয়ালটিয়ার
ষ্টেশনের দুই ধারে উঁচু পাহাড়।
টুরিস্ট কোচ্‌টি সেথা হ'ল কাটা
তখন মাঝরাত প্রায় হবে দু'টা।
আমরা তীর্থযাত্রী জনা পঞ্চাশ
মোটঘাট সাথে ছিল তাও একরাশ।
ভোরের আলো পেয়ে ঘুম ঘুম চোখে
যাত্রীদল নেমে পড়ে ষ্টেশনের বুকে।
চোখমুখ ধুয়ে সারা হ'ল প্রাতরাশ
দল বেঁধে চাপা হ'ল তারপর বাস।
যাত্রা শুরু হ'ল দূর সীমাচলম্
পাহাড়ী পথ তবু নয় দুর্গম।
একটি বাস ছেড়ে আর একটি বাস
পায়ে হেঁটে পুণ্যলাভ কারুর বিশ্বাস।
উঁচু উঁচু সিঁড়ি বয়ে কিছু পথ হেঁটে
'নরসিংহ' মন্দিরের আসিলাম গেটে।
সানাইয়ে টোড়ীরাগে কর্ণাটকী সুর
মন্দিরের চারিদিক করে ভরপুর।
বেহালার সাথে তাল দেয় মৃদঙ্গম্
আরতি ঘণ্টায় ভরা সীমাচলম্।

একটি প্রবেশপত্র ক'রে সংগ্রহ
দেখা হ'ল দেবমূর্তি শিব বিগ্রহ।

পাথরের গায়ে গায়ে নরসিংহ মূর্তি
চারিদিকে পৌরাণিক স্থপতি কীর্তি।

ঘুরে ঘুরে যেতে হয় মন্দির প্রাঙ্গণ
তারপর শিবলিঙ্গ হয় দরশন।

সামনে উঠানে বসে ছোট এক মেলা
চুড়ি-হার কেনে যাত্রী পাথরের থালা।

একধারে কিছু দূরে সিঁড়ি ভেঙে পাশে
তীর্থযাত্রী শিলাখণ্ডে জল দেয় শেষে।

কানা খোঁড়া ভিখারী দু-ধারে রাস্তায়
সারে সার বসে আছে দু-হাত বাড়ায়।

সাধু-সন্ন্যাসী কিছু সাধনায় রত
মুসাফির ফকির হেথা আসে অবিরত।

পাহাড় ও বনছায়া সারা অঞ্চল
চেয়ে চেয়ে দেখে হয় চিত্ত বিহ্বল।

চারিদিক শিলাস্তূপ 'সীমাচলম্'
নিশ্চুপ নিরালা তীর্থ শুধু দেখিলাম।

॥ তিরুপতি ॥

আটটায় লোকাল ট্রেন ছাড়ে 'রেণীগুন্টা'
'তিরুপতি ইষ্ট' যেতে লাগে আধঘন্টা।

ষ্টেশনেতে জমে ভিড় চলে ঠেলাঠেলি
অন্ধ্রদেশের প্রায় যাত্রী সকলি।

আগে যেতে যাত্রী সব ছুটে প্রাণপণ
রাস্তার অপর পারে বাসের ষ্টেশন।

সার সার দেয় সব বাসের লাইন
রোগা মোটা লম্বা দেহ কেউ কিছু ক্ষীণ।

একটি একটি ক'রে আসে ছেড়ে যায়
ঘুরে ঘুরে ছোটে বাস পাহাড় মাথায়।

একটি পাহাড় চূড়ো শেষ হ'য়ে গেলে
আর একটি পাহাড় যেন দেয় পাখা মেলে।

চারিদিকে দেখা যায় পাহাড়ের মালা
তলায় গভীর খাদ ছোট গাছপালা।

প্রায় ঘন্টাদেড় যাত্রা হলে শেষ
মনে হয় যেন এক নূতন সে দেশ।

ঘর বাড়ি পাহাড়ে হয়েছে অনেক
যাত্রীবাস, ধর্মশালা, দোকান শতেক।

বাগানের শোভা নানা বগেনভিলা
পথের দু-ধারে যেন বসে গেছে মেলা।

উঁচু নিচু পথ যায় মন্দিরের দিকে
দলে দলে যাত্রী যেন চলে অভিষেকে।
'তিরুপতি বালাজী'র মন্দির বিরাট
উঠানের চারিদিকে বসে গেছে হাট।
রয়েছে আপিসঘর দ্বারীদারোয়ান
সঙ্গিন বন্দুকধারী দেহ সাঁজোয়ান।
বিরাট চাতালে যাত্রী হ'য়ে গেছে জড়
খাঁচায় লাইন দিতে বেশ সব দড়।
হাজার হাজার লোক লোহার খাঁচায়
'তিরুপতি' নারায়ণে দর্শন চায়।
অন্ধ্র, তামিল কেহ কর্ণাটকবাসী
আমরা ক'জন ছিলাম বাঙালি প্রবাসী।
এক দুই তিন চার কেটে যায় ঘণ্টা
ছট্‌ফট্ করে মন বুঝি যায় প্রাণটা।
ভিতরে প্রবেশ ক'রে জুড়াল যে মন
'তিরুপতি' নারায়ণ হ'ল দরশন।
অন্ধকার গুহায় যেন জ্বলিছে প্রদীপ
সারে সারে যাত্রী পরে কপালেতে টিপ।
সোনায় রূপায় বুঝি দোরগুলি মোড়া
কি যেন রত্ন দিয়ে বাঁধা কিছু তোড়া।
মন্দিরের চারিদিকে বিরাট প্রাঙ্গণ
ঘুরে দেখে মনে হ'ল সার্থক জীবন।
দক্ষিণ ভারতের সেরা তীর্থভূমি
ফিরে যেতে বারে বারে তাইতো প্রণমি।

॥ মহাবলীপুরম্ ॥

চেঙ্গলপাট্টু হ'তে 'মহাবলীপুরম্'
দেড়ঘন্টা বাসে চ'ড়ে মোরা আসিলাম।
কেবল তেঁতুলগাছ পথের দু'ধার
নারিকেল ঝাউবন কিছু সারে সার।

কিছুদূর যেতে যেতে এল 'পক্ষিতীর্থ'
সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়েতে ওঠে যাত্রী নিত্য
বহু ঘরবাড়ি পথ পার হয়ে শেষে
'রঙ্গনাথ মন্দিরে' পৌঁছালাম এসে।
প্রাচীন ঐতিহ্য-স্মৃতি পাহাড়ের গায়
পৌরাণিক ইতিহাস আজও সাক্ষ্য দেয়।

চারিদিক খোলা দূর শুধু নীলাকাশ
ঝাউবনে লাগে এসে সাগর বাতাস।

মহাবলীপুরম্ সি-বিচ চিক্‌চিক্ বালি
সাগরের ঢেউ এসে আছড়ায় কেবলি।

পাথরের ভগ্নাবশেষ বিষ্ণুমন্দির
সূর্যরথ পাষাণের সাগরের তীর।

পাথর প্রাচীর দেওয়া ঘেরা চারিদিক
সোনালী সূর্য আভা পড়ে ঝিক্‌মিক্।

নির্জন নিরালা নয় তবু মনোরম
পর্য্যটক আসে যায় বেশ কিছু কম।

।। পণ্ডিচেরী ।।

'ভিল্লুপুরমে' কাটে রাতের কিছুক্ষণ
ভোরের একটু পরে 'পণ্ডিচেরী' ষ্টেশন।
ষ্টেশনটি ছোট তবু বেশ ছিমছাম
একধারে ঘরবাড়ি একধারে গ্রাম।
সামনে চোখে পড়ে বিশ্রামাগার
অতীতের ছায়া পড়ে তাতে কতবার।
বেতের চেয়ার আর আরাম কেদারা
কত গুণীজন এসে করে ঘোরা ফেরা।
বাহিরে রাস্তায় চলে বহু পথচারী
রিক্সায় চ'ড়ে দিনু আশ্রমে পাড়ি।
'অরবিন্দ' 'শ্রীমা'র শান্তি-নিবাস
কৃষ্ণচূড়ার তলে স্মৃতির নিঃশ্বাস।
আশ্রমে ফুলের শোভা সবুজের মেলা
নীরবে প্রবেশ করে ভক্ত দুইবেলা।
অরবিন্দ দর্শন বাণী বই কেনাকাটা
প্রতিদিন চলে সেথা খালিপায়ে হাঁটা।
রাস্তার দুই ধারে আশ্রম নিবাস
স্নিগ্ধ-শান্তি বুকে রহে বার মাস।
নিয়মিত খোলা রহে ভোজনশালা
যাত্রীদল সারে সারে হাতে ল'য়ে থালা।
দেখে দেখে চারিদিক জুড়াইল চোখ
পণ্ডিচেরী আশ্রম দেখা হ'ল সার্থক।

।। ত্রিচিনাপল্লী ।।

ত্রিচিনাপল্লী এক প্রাচীন শহর
ইতিহাস দেয় এর অনেক খবর।

প্ল্যাটফরমে ট্রেন এল প্রাণচঞ্চল
ষ্টেশনে রকমারি বড় বড় স্টল।

সামনে নিয়ত ঘণ্টা বাজে গির্জায়
অতীতের কত কথা মনে পড়ে যায়।

ইংরাজ ফরাসীর কর্ণাটক লড়াই
'টিপু সুলতানের' কথা হেথা খুঁজে পাই।

পথের দু'ধারে আছে গাছ দেবদারু
মন্দিরের মত সব মোটা আর সরু।

চওড়া রাস্তা বেশ কালো পিচের
কোথাও ছাউনি ঘেরা স্ট্যাণ্ড বাসের।

এক দুই করে বাস কত যে আসে
কয়েক মিনিট পরে ছেড়ে যায় শেষে।

এমনি একটি বাসে মোরা যাত্রীদল
চেপে বসে দেখি সারা শহর চঞ্চল।

অতি পুরাতন সব গাড়ি-বারান্দা
অন্দরে বাস করে কত বাসিন্দা।

আবার নূতন আর্টে বাড়ি দশতলা
কত যে বাহার তাতে যায় নাকো বলা।

বড় বড় দোকানেতে চলে কেনাকাটা
রাতের আঁধারে দেখি লাইটের ঘটা।

সারাদিন পথ হাঁটে লোক শত শত
জমকালো শহর বটে দেখিবার মত।

দীঘি যেন মাঝখানে ঘেরা পাঁচিল
পাশ দিয়ে চলে তার লোক পিল্‌পিল্‌।

তারি পাশে চোখে পড়ে রক্‌ টেম্পল
সিঁড়ি ভেঙে ওঠা তাও বেশ চাই বল।

তলায় ঘণ্টা শুনি গণেশ-মন্দিরে
হাত জোড় ক'রে যাত্রী চলে ফিরে ফিরে।

হেথায় অনেক ধনী বুঝি করে বাস
দোকানের বাহার দেখে হ'ল বিশ্বাস।

বাস চ'ড়ে আরো দেখা হ'ল মন্দির
'জম্বুকেশবে' যেন ধরে নাকো ভিড়।

মন্দিরে কত মূর্তি আছে দেখিবার
বিরাট প্রাঙ্গণ আর পাথর পিলার।

আরো কিছু দূর যেতে লাগে 'শ্রীরঙ্গম্‌'
বিশাল মন্দির পাশে 'কাঞ্চিপুরম্‌'।

মন্দিরে পাথর মূর্তি দেখি হেঁটে হেঁটে
জুড়াইল চোখ দু'টি ক্লান্তি নাই মোটে।

ঘুরে ঘুরে 'ত্রিচিনাপল্লী' দেখা হ'ল শেষ
তারপর ট্রেনে চ'ড়ে আর একটি দেশ।

॥ রামেশ্বরম্ ॥

সেতুবন্ধন পার হই ব্রীজ পাম্বান্
পার হ'য়ে আসিলাম সাগর-তুফান।

সকাল আটটায় হবে মোরা আসিলাম
বহু আকাঙ্খিত সেই রামেশ্বরম্।

লোকারণ্য চারিদিক ছিমছাম ষ্টেশন
বিহ্বল নেত্রে দেখি পবিত্র সে স্থান।

ছবির দোকান আর চায়ের স্টল
গেট দিয়ে পার হয় তীর্থযাত্রী দল।

সামনে রাস্তায় টাঙ্গা দাঁড়ান কয়টি
যাত্রীদল চ'ড়ে তাতে করে হুটোপাটি।

যেতে যেতে চোখে পড়ে ঘরবাড়ি কত
'রামেশ্বর' দ্বীপ ছোট দেখিবার মত।

বাজারে লোকজন করে কেনাকাটা
কালো বেঁটে চলে লোক কেউ হবে মোটা।

কিছুদূর গিয়ে দেখি সমুদ্র নীল
'রামায়ণে'র ছবির সাথে তার আছে মিল।

হেথায় সমুদ্র স্থির নহে চঞ্চল
চান সেরে নিয়ে দেহ হল নির্মল।

তারপর একটু দূরে 'রামেশ্বর' মন্দির
বিশাল গগনচুম্বী চক্ষু হল স্থির।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখি পাষাণ মুরতি
জ্বলিছে প্রদীপশিখা কোথাও আরতি।

রামেশ্বর শিলামূর্তি দেখি অন্ধকারে
কোথাও সোনার চূড়া মন্দির উপরে।

পাষাণ মুরতি সবি দেবের প্রাসাদ
অন্তরে জাগায় এক ভক্তির স্বাদ।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণের আঁকা কত ছবি
মনে পড়ে অতীতের 'বাল্মীকি' কবি।

পাহাড় মাইল দূরে গন্ধমাদাম্
'শ্রীরাম' চরণ চিহ্নে করিনু প্রণাম

॥ মীনাক্ষী মন্দির ॥

পরিচ্ছন্ন ইমারত 'মাদুরা' শহর
বিদেশ ভ্রমণে এসে কি দিব উত্তর।
দেখিলাম গগনচুম্বী 'মীনাক্ষী' মন্দির
দক্ষিণ ভারতে এক নিশানা কীর্তির।
কারুকার্য পাথরের কত দেবদেবী
পাথরে রঙিন আঁকা পৌরাণিক ছবি।
কারুকার্য ভাস্করের কত যে নিখুঁত
হাজার পাথর মূর্তি ড্রাগন অদ্ভুত।
কোথাও রাবণ মূর্তি দেব-নারায়ণ
দেবদেবী দেখে কত লাগে শিহরণ।
ভিতরে প্রবেশ করি হইনু বিহ্বল
তীর্থযাত্রী ঘোরে ফিরে নহে চঞ্চল।
অন্ধকার পাষাণে দেখি 'মীনাক্ষী' মূর্তি
কোন্ অতীতের এক ঘুমন্ত কীর্তি।
তীর্থযাত্রী সারে সারে চলে হাত জোড়
পাণ্ডারা ছোঁয় মাথা ফিরে চলে মোড়।
অর্ধ মাইল হবে তার নাহি শেষ
কত যাত্রী দলে দলে কার কোথা দেশ।
মাঝে পুকুর এক ঘেরা চারিদিক
স্বচ্ছ পরিষ্কার জল করে চিক্‌চিক্।
স্নান করি যাত্রী কত চলে কুতূহলে
'মীনাক্ষী'দেবীর মূর্তি দেখা শেষ হ'লে।
একটি নারিকেল আর লয়ে ফুলডালি
দেবীর চরণতলে দিনু অর্ঘ্য তুলি।

॥ কোদাইকানাল ॥

'মাতুরাই' থেকে বাস করা হ'ল ভাড়া
'কোদাইকানাল' যেতে প'ড়ে গেল তাড়া।

সকাল সাতটা নাগাদ ঠিক বাস ছাড়ে
আমরা সাথে সব নিই মুড়িচিঁড়ে।

হু-হু করে বাস ছোটে ঘরবাড়ি ফেলে
জমকাল 'মাধুরা' শহর যায় কোথা চ'লে।

হাইওয়ে এসে পড়ে দুর পথ সোজা
দু'ধারে তেঁতুল বন দেখে লাগে মজা।

দূরে দূরে খোলা মাঠ ছোট চালা বাড়ি
আরো দূরে পাহাড় শুধু দিয়ে চলে সারি।

যাত্রীদের কেহ গায় ভাটিয়ালী গান
কি যেন উদাস সুরে ভ'রে ওঠে প্রাণ।

এমনি দেখে দেখে পথের দু-ধার
চোখ হ'তে সরে গেল সব ছবি আর।

এবার পাহাড় এল শুধুই পাহাড়
নিচু উঁচু আশেপাশে কেবলি পাহাড়।

বাস ছোটে এঁকে বেঁকে পাহাড় মাথায়
পাহাড়ের মালা গাঁথা আকাশের গায়।

উঁচু উঁচু গাছ আর চাঙড় পাথর
নিচেতে গভীর খাদ পড়িছে নজর।

'কোদাইকানালে' আরো উপরেতে দেখি
কালো মেঘ বারে বারে দেয় শুধু উঁকি।

রোদ ক্রমে সরে যায় নেমে আসে ছায়া
উপরে চুড়ায় মেঘ করে আসা যাওয়া।

গায়েতে চাদর দিয়ে দেহ কাঁপে শীতে
আট হাজার ফিট্ উঠে এসেছি উঁচুতে।

মেঘ চলে চারিদিক রোদ নাই মোটে
'মুসৌরীর' পাহাড়ের মত মনে হয় বটে।

'অ্যাসট্রো অব্সারভেটরি' দূরবীন ঘর
'ফয়োরি পার্ক' বাগিচা অতি মনোহর।

সেলোফল্‌সে তোড়ে নামে অবিরাম জল
সাদা ফেনা জমে ওঠে গহ্বর অতল।

সুইসাইড পয়েন্ট দেখে লাগে শিহরণ
ঝাঁপ দিলে হেথা হ'তে নিশ্চিত মরণ।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কাঠের বাড়ি
ছবি ছবি দেখার মত কত রকমারি।

'কোদাইকানাল' লেক দেখিবার মত
নৌকা চড়ে হাল টানে যাত্রী অবিরত।

বেঞ্চিপাতা সারে সার খোলা চারিধার
অনেকেই বসে দেখে লেকের বাহার।

'কোদাইকানাল' লেক জল তরতর
কখনও ঝিলিক্ রোদ তাহার উপর।

কেউ ফটো তোলে চ'ড়ে ঘোড়ার পিঠে
হিল্‌স্টেশনে ঘুরে কারু সাধ মেটে।

পাহাড় প্রাচীর শুধু যেদিকে তাকাই
'নৈনিতাল' লেকের সাথে কিছু মিল পাই।

ঘণ্টা চারেক ধরে চারিদিক ঘুরে
আবার বাসেতে মোরা আসি সব ফিরে।

সাড়ে তিনঘণ্টা লাগে বাসে ফিরে যেতে
সন্ধ্যায় চলে না থাকা হেথা কোনমতে।

॥ কোভালামে সূর্য নামে ॥

★

'কোভালামে' সূর্য্য নামে—
দূরে নীল রক্তাক্ত আকাশ
হু-হু করে পাগল বাতাস।
শুধু নীল আরব সাগরে
রক্ত গোলক নামে ধীরে।
ঢেউ এসে বালিতে আছড়ায়
একরাশ ফেনা জমে
'কোভালামে' সূর্য নামে।
ছবি ছবি কতগুলি ঘর
একধারে পাহাড় পাথর।
'কোভালাম্' সি-বিচে—
ঢেউ এসে পাক খায়
ছেলেমেয়ে ছুটে যায়।
খুশী মনে করে ডাকাডাকি
আর নহে বাকি।
সাগর আকাশে রাঙা জলছবি
ক্রমে আসে মুছে।
আঁধার ধীরে জমে
'কোভালামে' সূর্য্য নামে।